স্বপ্নের সীমা

প্রফুল্ল রায়

জ্ঞানোদয়
১৬ সি, নিমতলা লেন,
কলিকাতা-৬

প্রকাশ কাল :   ১লা বৈশাখ ১৩৭১

প্রকাশিকা :   রত্না রায়

মুদ্রাকর :
গোপালচন্দ্র পাল
স্টার প্রিন্টিং প্রেস
২১/এ, রাধানাথ বোস লেন
কলিকাতা-৬

অগ্রজপ্রতিম

শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য

শ্রদ্ধাস্পদেষু

বাজারের মাঝমধ্যিখানে ঠিক চৌরাস্তার ওপর ফটিককে নামিয়ে বাসটা চলে গেল।

কলকাতা থেকে বারো চোদ্দ মাইল উত্তরে এই শহরটার নাম রাজানগর। আর ফটিক যেখানে বাস থেকে নেমেছে সেটা এ শহরের সব চাইতে জমজমাট অংশ। অর্থাৎ চৌরাস্তাটাকে ঘিরে রকমারি দোকানপাট, রেস্টুরেন্ট, সিনেমা হল, গ্যারেজ, পাম্পিং স্টেশন ইত্যাদি ইত্যাদি। রাজানগরের মানুষ জায়গাটাকে বলে বাজার পাড়া।

এখন দুপুর। সূর্যটা খাড়া মাথার ওপর স্থির হয়ে আছে। যেদিকে চোখ ফেরানো যাক, রোদের ছড়াছড়ি। কিন্তু সময়টা হেমন্তকাল, কার্তিক মাস শেষ হয়ে আসছে। তাই এখন রোদে জেল্লা নেই; আর তেমন করে তা গায়েও লাগে না। হেমন্তের এই রোদ বড় সুখদায়ক।

মাসখানেক আগে আশ্বিনের শেষাশেষি এবার পুজো গেছে। আকাশ তখন ছিল পালিশ-করা আয়নার মতো ঝকঝকে। কাচের ওপর ধুলোবালি জমলে যেমন দেখায় আকাশটা এখন অবিকল তেমনি।

বাতাসে এর মধ্যে টান ধরতে শুরু করেছে। গাছের পাতারা সতেজ লাবণ্য হারিয়ে খসখসে হয়ে যাচ্ছে। দুরন্ত হানাদারের মতো শীত যে আসছে, চারপাশে তারই ভূমিকা।

ফটিক বাস থেকে নেমে সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। তার বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। ছ'ফুটের মতো টান টান পেটানো চেহারা। চওড়া কাঁধ; হাত জানু ছাড়িয়ে নেমে গেছে। মোটা

মোটা মজবুত হাড়ের ফ্রেমের ওপর তার যে শরীর তাতে এক গ্রাম বাজে চবি নেই। চুল ছোট ছোট করে একেবারে চামড়া ঘেঁষে ছাঁটা। গায়ের রঙ পোড়া ঝামার মতো, হাতের চেটো জুড়ে শক্ত শক্ত কড়া।

ফটিকের পরনে জাহাজী ক্রুদের মতো টাইট নীল ফুল প্যাণ্ট আর লম্বা লম্বা ডোরা দেওয়া শার্ট। পায়ে মোটা সোলের ক্যাম্বিসের জুতো। প্যাণ্ট-শার্ট দুটোই ময়লা, দোমড়ানো মোচড়ানো। তার কাঁধে দড়ি-বাঁধা বেডিং আর হাতে ঝোলানো ঢাউস ষ্টিলের বাক্স।

জাহাজেই কাজ করে ফটিক। সে স্টোকার; দেড় শ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড উত্তাপের মধ্যে দাঁড়িয়ে বয়লারে কয়লা ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেওয়াই তার কাজ।

চৌরাস্তার মোড়ে ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে চারদিক দেখছিল ফটিক। এ শহরের যত বাড়িঘর অলিগলি বস্তি, এমন কি প্রতিটি ধুলোর কণা তার চেনা, তবু সব কিছু নতুন নতুন মনে হচ্ছে।

কতকাল বাদে রাজানগরে ফিরল সে? ফটিকের পরিষ্কার মনে পড়ল, পাক্কা দু'বছর পর। গেল পূজোয় ঠিক বিজয়া দশমীর দিন খিদিরপুর ডক থেকে সে ব্যাঙ্ক লাইনের জাহাজে উঠেছিল। কোথায় প্যাসিফিক, কোথায় সুয়েজ, কোথায় মেডিটারেনিয়ান আর কোথায়ই বা ব্ল্যাক সী—দুটো বছর দুনিয়ার দরিয়ায় দরিয়ায় হানা দিয়ে আজই সকালে তাদের জাহাজ আবার খিদিরপুর ডকে ফিরে এসেছে।

জাহাজ থেকে নিজেকে 'রিলিজ' করিয়ে নিতে ঘণ্টা তিন চারেক সময় লেগেছিল। তারপর ডকের কাছেই একটা পাঞ্জাবী হোটেলে কষা মাংস, তন্দুরী আর এক গেলাস লস্যি খেয়ে সোজা চলে এসেছে শ্যামবাজার খালপোলের কাছে, সেখান থেকে রাজানগরের বাস ধরেছিল।

বাজার-পাড়ার এই চৌরাস্তাটা চারটে হাতের মতো চারদিকে ছড়িয়ে আছে। একটা গেছে দক্ষিণে, নৈহাটি-কাঁচড়াপাড়ার দিকে। উত্তরেরটা কলকাতায়। পুবেরটা গেছে রাজানগর রেলস্টেশনে আর পশ্চিমেরটা নদীর দিকে। রাজানগরের পশ্চিমে গঙ্গা।

দুপুরে চারদিক ঝিম মেরে আছে। রাস্তায় লোকজন খুব কম। ফটিক যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার উল্টোদিকে ঝাঁকড়ামতো বট গাছটার তলায় সাইকেল রিক্সার জটলা। রিক্সাগুলোকে সারি সারি দাঁড় করিয়ে রিক্সাওলারা সীটে ঘাড় গুঁজে ঝিমুচ্ছে, কেউ কেউ অবশ্য সীটের তলার নিচু জায়গায় বসে বিড়ি ফুঁকছিল।

ফটিক যাবে পশ্চিমের রাস্তায়। যেখানে যাবে, হেঁটে গেলে কম করে আধঘণ্টার মতো লাগবে। রিক্সায় উঠলে অবশ্য হুস করে পাঁচ মিনিটে পৌঁছুনো যায়।

ফটিক একবার ভাবল, একটা সাইকেল-রিক্সা নেবে। পরক্ষণেই মতটা পাল্টে ফেলল। না, হেঁটেই যাবে। ভাবামাত্র পশ্চিমের রাস্তা ধরে সে হাঁটতে লাগল।

কিন্তু দু পা যেতে না যেতেই কে যেন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকল, 'ফটকেদা, ফটকেদা—'

এদিক-সেদিক তাকিয়ে কারোকে দেখতে পেল না ফটিক।

সেই গলাটা আবার শোনা গেল, 'এই যে গুরু, আমি এখানে। একটু দাঁড়াও, আসছি—'বলতে বলতে উল্টোদিকের একটা চায়ের দোকান থেকে এক দৌড়ে যে বেরিয়ে এল তার নাম পেনো।

আসল নামটা কোন কালে পান্নুগোপাল টোপাল ছিল, লোকের মুখে মুখে অবহেলায় আর তাচ্ছিল্যে ওটা 'পেনো' হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পেনোর বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের মতো। সারা গায়ে মাংসের চাইতে হাড় বেশি। কাঁধ-কণ্ঠা-কনুই, যে দিকেই তাকানো যাক,

গজালের মাথার মতো হাড় ঠেলে বেরিয়ে আছে। ভাঙা চোয়াড়ে গাল, মাথায় জটপাকানো ঝুপসি চুল, মুখময় খাড়া খাড়া দাড়ি পেখম মেলে আছে। ঘোলাটে চোখের তলায় শ্যাওলার মতো কালচে দাগ। পেনোর সমস্ত শরীর যেন গাঁট-পাকানো ঝুনো বাঁশ। পোড়া পোড়া কালো ঠোঁঠ, পোকায়-খাওয়া ট্যারা-বাঁকা দু'পাটি দাঁত। সেই দাঁতের ওপর বাসি রক্তের মতো পানের স্থায়ী ছোপ। পেনো দিনরাত পান চিবোয়।

তার পরনে চিটচিটে ঠোঁট ফুলপ্যান্ট আর বুকখোলা টী-শার্ট। প্যান্টটারঝুল এত ছোট যে হাঁটুর তলায় খানিকটা নেমেই শেষ। তা ছাড়া দারুণ টাইটও ; ওটা খুলতে গেলে নির্ঘাৎ সঙ্গে এক পর্দা চামড়া ওঠে আসবে।

ফটিক দাঁড়িয়ে গিয়েছিল ; তাকিয়ে তাকিয়ে পেনোর পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিচ্ছিল।

পেনো দাঁত বার করে হাসল, 'ফটকেদা আমায় চিনতে পারছ না? আলি তোমাদের পেনো মাকড়া গো।'

ফটিকও হাসল। তারপর অকথ্য একটা খিস্তি দিয়ে বলল, 'শালা তোমায় চিনব না!'

'যেমন করে তাকিয়ে ছিলে আমি তো ঘাবড়েই গেছলাম। ভাবলাম, গুরু বুঝি আমায় ভুলেই গেছে।'

ফটিক দাঁত বার করে বলল, 'ব্লাডি ব্যাস্টার্ড।' এটা তার আদর আর খুশির প্রকাশ।

চোখ গোল করে রগড়ের একটা ভঙ্গি করল পেনো, 'উরি ব্বাস, গুরু ইংরিজিতে খিস্তি ঝাড়ছে গো—'

ফটিক আগের কথার ছুতো ধরে বলল, 'জন্মে থেকে ওই মদনা-মার্কা চেহারা দেখছি, একবার দেখলে ও চেহারা ভোলা যায়! এ জন্মে তোমায় আমি ভুলছি না।'

'যা বলেছ মাইরি! একখানা চেহারা যা করেছি; যেন পূন্নিমের চাঁদ গো—'

আলতো করে পেনোর পায়ের গোছে একটা লাথি কসিয়ে দিল ফটিক, 'পূন্নিমের চাঁদ! ধর শালা এটা—'হাতের বাক্সটা পেনোর দিকে বাড়িয়ে দিল সে।

ব্যস্তভাবে বাক্সটা হাতে ঝুলিয়ে পেনো জিভ কাটল, 'এ হে-হে, একদম খেয়াল ছিল না আমি থাকতে তুমি মাল বইছ। দাও—দাও, ওটাও দাও—' ফটিকের কাঁধের বেডিংটা দেখিয়ে দিল পেনো।

'থাক থাক, অত ভক্তি দেখাতে হবে না।' ফটিক বলতে লাগল, 'রাস্তায় ল্যাম্প পোষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে আর কী হবে, এখন চল্—'

'হাঁ-হ্যাঁ, চল—'

পশ্চিমের রাস্তা ধরে দুজনে পাশাপাশি হাঁটতে লাগল। যেতে যেতে পেনো বলল, 'অনেক দিন পর তোমায় দেখলুম ফটকেদা—'

'হুঁ—'

'এবার কদ্দিন পর যেন রাজানগর এলে?'

'দু'বচ্ছর।'

'এ্যাদ্দিন সেই জাহাজে জাহাজেই ঘুরছিলে?'

'হুঁ—'

একটু ভেবে নিয়ে পেনো বলল, 'তোমাদের জাহাজ কবে কলকাতায় ফিরল?'

ফটিক বলল, 'আজই—সকালবেলা।'

'দু'বচ্ছরে অনেক দেশ ঘুরলে, না?'

'হুঁ—'

পেনো বলতে লাগল, 'বেশ আছ মাইরি ফটকেদা—'

ঘাড় ফিরিয়ে ফটিক জিজ্ঞেস করল, 'কি রকম?'

'জাহাজে চাকরি জুটিয়ে সারা দুনিয়া চষে বেড়াচ্ছ। আর আমি

শালা রাজানগরের বাইরে কোনদিন বেরুতেই পারলাম না। বড় জোর কলকাতা পর্যন্ত আমার দৌড়—'

গলার ভেতর ফটিক অস্পষ্ট একটা শব্দ করল।

পেনো আবার কী বলতে যাচ্ছিল, ফটিক তার আগেই বলে উঠল, 'রাজানগরের খবর টবর বল—'

'নতুন খবর কিছু নেই। ছু' বছর আগে যেমন দেখে গিয়েছিলে ঠিক তেমনিই চলছে। তবে যত দিন যাচ্ছে এখানে লোকজন হুড়হুড় করে বেড়ে যাচ্ছে।'

'তুই আজকাল কী করছিস?'

এক হাতে ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে পেনো বলল, 'যা করতাম

ফটিক বলল, 'তার মানে সেই মেয়েমানুষের কারবারই চালাচ্ছিস?'

'তুমি তো সবই জানো ফটকেদা—' দাঁত বার করে হাসতে লাগল পেনো।

ফটিক বলল, 'ব্লাডি, সান অফ বীচ।' চলতে চলতেই পেনোকে আরেকবার লাথি কসাল সে।

পেনো হাসছিলই। বলল, 'জাহাজের চাকরিতে ঢুকবার পর তোমার গুরু খুব উন্নতি হয়েছে।'

ফটিকের চোখমুখ কুঁচকে গেল, 'কেমন?'

'ইংরেজি ছাড়া এখন আর খিস্তিই ঝাড়ো না—'

'শালা খচড়া—'ফটিক চটে উঠতে গিয়ে হেসে ফেলল।

কথায় কথায় বাজারপাড়া পেরিয়ে ওরা অনেকটা চলে এসেছিল।

এখন রাস্তার ছু'ধারে পুরনো আমলের বাড়িঘর, কল-কারখানা, বস্তি। মাঝে মাঝে ফাঁকা জায়গা।

রাজানগর কারখানা শহর। এখানে নানা ধরনের কারখানা—কাঁচকল, চটকল, ষ্টিল রোলিং মিল, ফাউণ্ড্রি, রঙের কল। মাথার ওপরে তাকালে দেখা যাবে অগুনতি লম্বা চিমনি আকাশের গায়ে বিঁধে রয়েছে।

কথা বলতে বলতে চারিদিক দেখছিল ফটিক। শহরটা দু'বছর আগের মতোই আছে। পরিবর্তনের মধ্যে হঠাৎ হঠাৎ চমকে দেবার মতো দু-চারটে নতুন ডিজাইনের ঝকঝকে বাড়ি আর নতুন একটা সিনেমা হল 'ইন্দ্রাণী টকীজ' চোখে পড়ল।

হেমন্তর নির্জীব রোদ গায়ে মেখে দুপুরের নিরিবিলি রাস্তা ধরে হাঁটতে খুব ভাল লাগছিল ফটিকের, খুব ভাল লাগছিল।

বাজারপাড়াটা পেরিয়ে আসার পর থেকেই এক ঝাঁক পাখি সঙ্গ নিয়েছে। মাথার উপর তারা উড়ছিল আর টুই টুই করে সমানে ডেকে যাচ্ছিল।

ফটিক ডাকল 'এ্যাই পেনো—'.

পেনো তক্ষুণি সাড়া দিল, 'বল '

'পঞ্চাননতলায় আমার সেই ঘর দুটো আছে রে?'

'না গুরু—'

ফটিক চমকে উঠল, 'নেই! বলিস কিরে?'

পেনো বলল, 'গেল বছর দারুণ ঝড়ফড় আর বর্ষা গেল না? তাতেই পড়ে গেছে।'

'তোকে না বলে গিয়েছিলুম মাঝে মাঝে আমার ঘর দুটো দেখে আসবি '

'ফাঁক পেলেই তো দেখতুম। কিন্তু তুমিই বল ফটকেদা, ঝড়ে যদি ঘর শুয়ে পড়ে আমি শালা কি করতে পারি। চাল মাথায় করে স্ট্যাচু হয়ে তো দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না।'

ফটিক খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'ঘর নেই। তা হলে থাকব কোথায়?'

পেনো তক্ষুনি বলল, 'থাকবার জায়গার যেন অভাব। জাহাজ থেকে ফিরে নিজের ঘরে কত থাকো আমার জানা আছে! পঞ্চানন-তলায় আর যেতে হবে না।'

'তবে কোথায় যাব?'

'তুমি মাইরি বড্ড লকড়াবাজি করছ ফটকেদা। রাজানগর এসে বেশির ভাগ সময় থাকো কোথায়?'

'এই দুপুর বেলা মেয়ে-পাড়ায় ঢোকাতে চাইছিস মাকড়া?'

'হে-হে গুরু স্বগ্‌গে যাবে, তার আবার দুপুর-সকাল কি!' বলতে বলতে চোখ টিপল পেনো।

খানিকক্ষণ ভেবে ফটিক বলল, চল্‌ শালা, তোর সঙ্গে সগ্‌গেই যাই—'

পঞ্চাননতলায় যেতে হলে ডান দিকের একটা রাস্তা ধরতে হয়। ওরা সেদিকে গেল না, সোজা হাঁটতে লাগল।

ফটিক আবার কি বলতে যাচ্ছিল, আচমকা কি যেন মনে পড়ে যেতে পেনো চেঁচিয়ে উঠল, 'এ হে-হে-হে...'

'কি হল রে, গলার ভেতর ঘোড়ার ডাক ডাকছিস যে?'

'একটা খবর দিতে একদম ভুলে গেছলাম ফটকেদা।'

'কি খবর?'

জ্বলজ্বলে চোখে ফটিকের দিকে তাকিয়ে খুব উৎসাহের গলায় পেনো বলতে লাগল, 'মেয়ে-পাড়ায় দারুণ একটা ছুঁড়ি এসেছে।'

নাক কুঁচকে তাচ্ছিল্যের একটা ভঙ্গি করল ফটিক, 'তাই নাকি।'

'হ্যাঁ গো গুরু; এক্কেবারে এসপেশাল জিনিস।'

'স্পানিশ, ফ্রেঞ্চ, ইটালিয়ান, জাপানী ছুঁড়িদের চাইতেও তোর জিনিসটা বেশি এসপেশাল?'

'বাপের জন্মে কোনদিন মেম সায়েবের কাছে ঘেঁষি নি। তবে হ্যাঁ, দিশী ছুকরিদের কথা যদি বল মেয়েটা তাদের নাকে ঝামা ঘষে দিতে পারে।'

'বলছিস ?'

'হ্যাঁ গো। বলছি।' পেনো বলতে লাগল 'জানো ফটকেদা, টিয়ার জন্যে সারা রাজনগর একেবারে ম্যাড, সিরিফ দিওয়ানা বনে আছে।'

'মেয়েটার নাম বুঝি টিয়া ?'

'ইয়েস গুরু।'

আচমকা পেনোর গলা মোটা আঙুলে টিপে ধরল ফটিক। পেনোর মনে হল গলাটা এক্ষুনি পট করে ভেঙে লটকে পড়বে। যন্ত্রণায় মুখটা নীল হয়ে গেল সে চেঁচিয়ে উঠল, 'কি হল তোমার, কি হল ? গলা ছাড়ো মাইরি, যেমন করে ধরেছ সোজা অক্কা পেয়ে যাব।'

ফটিক গলা ছাড়ল না, 'ছুঁড়িটা যদি দারুণ না হয় তোর হাড্ডি ঢিলে করে ছাড়ব '

'আমার কথা মিলিয়ে নিও ফটকেদা। মা কালীর দিব্যি, এক ফোঁটা মিথ্যে বলিনি।'

পেনোকে ছেড়ে দিল ফটিক। পেনো গলায় হাত বুলাতে বুলাতে বলল, 'আঙুল না তো, সাঁড়াশী।'

ফটিক উত্তর দিল না। চোখের কোন দিয়ে পেনোকে একপলক দেখে নিয়ে সোজা হাঁটতে লাগল।

আর পেনো তার গায়ে জোঁকের মতো সেঁটে থেকে ঘ্যানঘেনে বৃষ্টির মতো অবিরাম টিয়ার কথা বলে যেতে লাগল।

পেনোর সঙ্গে ফটিকের প্রথম আলাপ হয়েছিল কবে ?

কিন্তু পেনো না, তার আগে ফটিকের জীবনের গোড়ার দিককার কিছু কথা বলে নেওয়া দরকার।

ফটিক এই শহরেরই ছেলে। রাজানগরের এক কোণে পঞ্চাননতলায় তাদের ছিল টিনের চালের কোমর-ভাঙা দু'খানা ঘর।

সংসারটা ছিল তাদের খুবই ছোট। সে, তার মা আর বাবা মোট এই তিনজন নিয়ে।

ফটিকের বাবা হরবিলাস ভটচার্জ ছিল পয়লা নম্বরের মাতাল, পয়লা নম্বরের জুয়াড়ী। তা ছাড়া ছিল চিটিংবাজ, লোফার এবং সত্যিকারের ফোর টোয়েন্টি। পায়ের তলা থেকে চুলের ডগা পর্যন্ত ভালোত্ব বলে কিছু নেই তার।

বাজারপাড়ার পেছন দিকে নকুল সাহার কাঠগোলায় সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে হরবিলাস যখন জুয়া খেলতে বসত, দিনরাতের হুঁশ থাকত না। ঘর-সংসার, বাহ্যি-পেচ্ছাপ ভুলে অনবরত খেলেই যেত, খেলেই যেত।

হাতের সামনে একটা ভেজা গামছা থাকত তার। খেলতে খেলতে মাথা গরম হয়ে উঠলে সেটা দিয়ে একবার করে মাথা মুছে নিত। খিদে পেলে কাঠগোলার একটা মিস্তিরি ফুলুরি আলুর চপ পেঁয়াজি আর মুড়ি কিনে এনে দিত।

তাসের বাজিই শুধু না, যত রকমের জুয়া আছে, তার কোনটাতেই অরুচি ছিল না হরবিলাসের। শুক্রবারের রাতটা কোন রকমে একবার পার করতে পারলেই হল, শনিবার ভোরে তাকে আর রাজানগরে আটকে রাখা যেত না। ছেলে-বউ মরুক বাঁচুক, পৃথিবী গোল্লায় যাক, হরবিলাস কলকাতায় রেসের মাঠে ছুটবেই। একবার কি জন্য যেন কলকাতায় ট্রেন আর বাস বন্ধ ছিল। হরবিলাস ঝাড়া চোদ্দ মাইল হেঁটে রেসের মাঠে হাজির হয়েছিল।

মদ খেতে পারত সে প্রচুর। শরীরটা ছিল ব্লটিং পেপারের মতো, বোতল পেলেই চোখের পলকে সোঁ সোঁ করে শুষে নিত।

তবে বিলিতী দামী জিনিসের দিকে হরবিলাসের ঝোঁক ছিল না। কালী মার্কা বাঙলা মাল আর তাড়িই তার পছন্দ। হরবিলাস বলত, 'আমার পেট হল শালার ভাগাড়, সেখানে কি আর হুইস্কি টুইস্কি সয়. বাঙলা জিনিস ঢালো, চোলাই ঢালো, আঃ প্রাণ জুড়িয়ে যাবে।'

কালী মার্কা আর জুয়া, এ তো গেল নেশার ব্যাপাব।

কিন্তু নেশাই তো সব নয়; তার ওপরে আছে পেট। একটা না, ছুটো না, তিন তিনটে পেট।

জুয়ার রোজগার বা কালী মার্কা বাঙলা মালে সেই পেট তো ভরে না; তার জন্য অন্য কিছু করা দরকার।

কিন্তু হরবিলাসের যা স্বভাব তাতে চাকরি-বাকরি বা ব্যবসা একেবারেই সম্ভব নয়। জুয়া ছাড়া অন্য কিছুতে লেগে থাকার মতো ধৈর্যও নেই তার।

কিন্তু রোজগার না হলে, বাইরে থেকে পয়সা না এলে চলে কী করে? প্রথম প্রথম হরবিলাস সোজা রাস্তাটাই ধরেছিল। সবার কাছেই সে হাত পাতত। ধার হিসেবেই চাইত। বিশ টাকা পঞ্চাশ টাকা থেকে ছু-আনা চার-আনা, যা-ই পাওয়া যাক, কোন কিছুতেই অরুচি ছিল না তার। আসল কথা কিছু পাওয়া চাই। রাজানগরে এমন কেউ ছিল না যার কাছে সে হাত পাতে নি। একবার হাত পাতলে কিছু আদায় হয় নি, এমন ঘটনা তার জীবনে নেই।

আসলে লোকটা ছিল চতুর অভিনেতা। ছেলেব অসুখ, স্ত্রী মৃত্যু-শয্যায় ইত্যাদি ইত্যাদি হাজার রকমের ধোঁকাবাজি দিয়ে মুখখানা অসম্ভব রকম করুণ করে যখন সে কাছে গিয়ে দাঁড়াত, কারো বাবার সাধ্য নেই তাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেয়। মানুষের মনে সহানুভূতি

নামে যে গোলমেলে জায়গাটা আছে সেখানে সুড়সুড়ি দেবার কৌশল ছিল তার হাতের মুঠোয়।

কলকাতার পাবলিক স্টেজে এসে নামলে অনেক এ্যাক্টরের নাক কান কেটে দিতে পারত হরবিলাস।

গোটা রাজানগর ছিল তার পাওনাদার। ধারের ব্যাপারে কোন রকম বাছ-বিচার ছিল না। দশ বছরের বাচ্চা থেকে আশী বছরের বুড়ো মেয়ে-পাড়ার বেশ্যা থেকে সাইকেল-রিক্সাওলা, নিরপেক্ষ ভাবে সবার কাছে ধার করে গেছে হরবিলাস।

ধার একবার নিলে ফেয়ত দেবার প্রশ্নই ওঠে না; তেমন স্বভাবই নয় হরবিলাসের। কাজেই একবার তু'বার যারা ধার দিয়েছে তিন বারের বার তারা হাত গুটিয়ে নিয়েছিল।

ধার যখন বন্ধ হল, তখন মাথায় ঘাম ছুটিয়ে রোজগারের অন্য রাস্তা ধরেছিল হরবলিাস। রাজানগরে যত পয়সাওলা লোক আছে, তাদের উড়ু উড়ু বয়সের ছেলেদের ধরত সে; তারপর মাল-টাল খাইয়ে কোন কোন দিন সোজা বাড়িতে নিয়ে আসত এবং নিজের বিয়ে-করা বৌর ঘরে ঢুকিয়ে দিত। আর বাইরের বারান্দায় বসে ফুক ফুক করে বিড়ি টানত।

হরবিলাসের বউ মানে ফটিকের মা'র ছিল মাথা ঘুরিয়ে দেবার মতো চেহারা। তার নাম ছিল গৌরী। ছোট্ট কপালের ওপর থেকে তার কালো চুলের ঘের। পাতলা নাকের তু'ধারে ঘন পালকে-ঘেরা টানা চোখ; গায়ের রঙ অশ্বিনের রৌদ্র ঝলকের মতো; গলা যেন সোনার ফুলদানী। মুখখানা পান পাতার মতো। হাত-পা-আঙুল, সব মোম দিয়ে গড়া। তার দিকে তাকিয়েই কেউ চোখ ফিরিয়ে নেবে সাধ্য কি।

যাই হোক, ঘণ্টা তু' তিন পর উড়ুক্কু বড় লোকের বাচ্চা বেরিয়ে এসে হরবিলাসের হাতে এক গোছা নোট দিয়ে চলে যেত। আর

ঘরের ভেতর তুই হাঁটুর ফাঁকে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকত গৌরী।

বাইরে বসে বসেই ঘন ঘন বিড়ি টেনে কিছুক্ষণ গৌরীকে লক্ষ্য করত হরবিলাস। তার পর উঠে ঘরের ভেতর চলে যেত। কয়েক ছটাক মধু ঢেলে গলার স্বরটাকে চটচটে করে সে বলত, 'কাঁদিস না, এ্যাই—কাঁদিস না—'

গৌরীর কান্না তাতে থামত না ; আরো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত।

এবার হাঁটু ভেঙে দ হয়ে স্ত্রীর গা ঘেঁষে বসতে বসতে হরবিলাস বলত, 'তুই যদি কেঁদেই যাস, আমিও মাইরি কেঁদে ফেলব।'

ভাঙা ভাঙা জড়ানো গলায় গৌরী বলত, 'তুমি স্বামী হয়ে আমাকে নরকে নিয়ে যাচ্ছ!'

দাঁত বার করে হাসতে হাসতে হরবিলাস বলত, 'নরক আবার কি, অ্যাঁ—নরক কি! তোর বড্ড ছুঁচিবাই—'

হাঁটুর ওপর জোরে জোরে কপাল ঠুকতে ঠুকতে গৌরী সমানে কেঁদে যেত, 'তুমি আমার সর্বনাশ করলে! আমার সর্বনাশ করলে!'

'আবার কাঁদে। তুই কি পাগলা হয়ে গেলি!'

'পাগলাই হয়ে যাব। তোমার মধ্যে এত পাপ—'

হরবিলাস চেঁচামেচি জুড়ে দিত, 'এ্যাই রে, এ্যাই রে—পাপপুণ্য, আবার এসব গোলমেলে কারবার টেনে আনছিস কেন বাবা? ধর না, তোর গায়ে একটা কেন্নো উঠেছিল, টোকা দিয়ে ঝেড়ে ফেলে দিলি। ব্যস। আর তার জন্যে লাভটা কী হল ভেবে দ্যাখ—'

গৌরী বলত, 'আমি কিছু ভাবতে চাই না, চাই না।'

হরবিলাস বলে যেত, 'পাগলামি করিস না মাইরি। ওই কুত্তার বাচ্চাগুলো যতই তোর ঘরে ঢুকুক না, তুই আমার যে বউ সে বউই আছিস ; আগুন সাক্ষী-করা ধর্মপত্নী। মাঝখান থেকে দ্যাখ কেমন পঞ্চাশটা টাকা হাতে এসে গেল।' একটু থেমে আবার বলত, 'আরে

বাপু পেট তো চালাতে হবে। তোর পেট, আমার পেট, ফটিকের পেট—অ্যাঁ, কথাটা সত্যি কিনা! তোর এত বিবেচনা, আর এই সোজা কথাটাই শুধু বুঝতে চাস না।'

গৌরী উত্তর দিত না।

হরবিলাস আবার বলত, 'শালা না খেয়েই যদি মরে যাস, পাপপুণ্য ধুয়ে জল খাবি!'

কিছু না বলে ফোঁপাতেই থাকত গৌরী।

তখন কত আর বয়স ফটিকের; বড় জোর আট দশ। তার আগের কথা মনে নেই; কিন্তু সেই আট দশ বছরের স্মৃতি একটু ভাবলেই ছবির মতো চোখের সামনে এসে দাঁড়ায়।

ফটিকের মনে আছে, হরবিলাস যেদিন সন্ধ্যের পর পয়সাওলা লোকের বাচ্চাদের ধরে এনে মা'র ঘরে ঢোকাত তার আগে বাড়ি থেকে তাকে তাড়িয়ে দিত। ফটিক কিন্তু খুব বেশিদূর যেত না, কাছাকাছিই থাকত। উঠোনের শেষ মাথায় একটা ঝাড়ালো করমচা ঝোপ ছিল; তার আড়ালে গিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকত; ভয়ে বুকের ভেতরটা হিম হয়ে যেত ফটিকের।

এই ভাবেই চলছিল। প্রথম প্রথম দারুণ কান্নাকাটি করত গৌরী। কিছুদিন পর চোখের জল শুকিয়ে গিয়েছিল তার; মুখ হয়ে উঠেছিল কঠিন; চোখ আক্রোশে যেন জ্বলতে থাকত। কারো সঙ্গে বিশেষ কথা বলত না তখন। মনে হচ্ছিল ভয়ঙ্কর কোন প্রতি-হিংসা সে নেবে; সেটা কোন্ দিক থেকে কিভাবে আসবে তা অবশ্য বোঝা যাচ্ছিল না।

প্রতিহিংসাটা শেষ পর্যন্ত গৌরী নিল, এত আচমকা, এত অপ্রত্যাশিত ভাবে যে তার জন্য কেউ তৈরি ছিল না।

সেদিন গৌরীর ঘরে রাজানগরের সব চাইতে বড় ইঁটখোলার মালিক সখিলাল মারোয়াড়ীর ছেলে রাজেশকে ঢুকিয়ে বারান্দায়

বসে বিড়ি ফুঁকছিল হরবিলাস; করমচা ঝোপের আড়ালে ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ফটিক।

ঘণ্টাখানেক পর দরজা খুলে রাজেশের সঙ্গে গৌরী বেরিয়ে এসেছিল এবং লম্বা মেটে উঠোন পেরিয়ে দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে বাইরের রাস্তায় চলে গিয়েছিল।

অন্য দিন ঘর থেকে বেরুত না গৌরী। মাতাল কুত্তারা চলে যাবার পর ঘরের ভেতর পাথরের মূর্তির মতো বসে থাকত।

সেদিন তাকে বেরিয়ে যেতে দেখে প্রথমটা থ হয়ে গিয়েছিল হরবিলাস। তারপর এক দৌড়ে ওদের কাছে গিয়ে বলেছিল, 'এ্যাঈ গৌরী, এ্যাই, যাচ্ছিস কোথায়?'

গৌরীর চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছিলেন, 'আমি চলে যাচ্ছি।'

'চলে যাচ্ছি মানে!'

'মানে চলে যাচ্ছি; আর কোনদিন ফিরব না।'

একটুক্ষণ থমকে থেকে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল হরবিলাস, 'ঘরের বউ একটা খচ্চরের বাচ্চার সঙ্গে চলে যাচ্ছি!'

'ঘরের বউ কি আর আমাকে রেখেছ! ভেবে দেখো—'

গৌরী আর দাঁড়ায় নি; রাজেশকে নিয়ে চলে গিয়েছিল।

আর সেই মুহূর্তে রাজানগরের সব চাইতে সেরা লোফার, জুয়াড়ি, মাতাল ও চিটিংবাজ লোকটা একেবারে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়েছিল। রাস্তায় লুটিয়ে বাচ্চা ছেলের মতো ফুঁপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে শুরু করেছিল।

ঘণ্টাখানেক কান্নার পর সেই যে ঘরে গিয়ে ঢুকেছিল তারপর সাতটা দিন আর বেরোয় নি। জুয়ার আড্ডা, রেসের মাঠ কিংবা বাঙলা মদের দোকান কিছুই তাকে বার করে নিয়ে যেতে পারে নি।

সাত দিন পর যখন সে ঘর থেকে বেরুল তখন একেবারে অন্য

মানুষ। ছেলেকে ডেকে বলেছিল, 'তোর মা তো ভেগে পড়ল; আমি ভাবছি এবার নাগা সন্ন্যাসী হয়ে যাব বুঝলি?'

গৌরী চলে যাবার পর ফটিক কম কাঁদে নি; কেঁদে কেঁদে সাতদিনে চোখমুখ ফুলিয়ে ফেলেছিল। যাই হোক উত্তর না দিয়ে সে বাপের দিকে তাকিয়েছিল।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ফটিকের পা থেকে মাথা পর্যন্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে হরবিলাস বলেছিল, 'তোর বয়েস কত হল রে ফটকে?'

ফটিক উত্তর দ্যায় নি।

হরবিলাস বলেছিল, 'গায়ে-গতরে তো দামড়া মোষ হয়ে উঠেছিস।'

ফটিক এবারও চুপ।

হরবিলাস বলেই যাচ্ছিল, 'তোর মা তো ভাগল; আমার রোজগারও শেষ। আমি আর বাপু তোকে খাওয়াতে পারব না। বুঝেছিস?'

ফটিক ঘাড় কাত করেছিল অর্থাৎ বুঝতে পেরেছে।

হরবিলাস আবার জিজ্ঞেস করেছিল, 'কী বুঝেছিস?'

ফটিক এবার মুখ খুলেছিল, 'তুমি আর আমাকে খাওয়াতে পারবে না।'

'সাবাস ব্যাটাচ্ছেলে। তুই একেবারে বাপকা ব্যাটা, সেপাইকা ঘোড়া!' তারিফের ভঙ্গিতে হরবিলাস ছেলের পিঠ চাপড়ে দিয়েছিল, 'শোন ফটকে, আমার আশা আর করিস না। এবার থেকে নিজেরটা খুঁটে খেতে শেখ। হাত আছে, পা আছে, চোখ আছে, দামড়া মোষের মতো গতরটাও আছে। বুঝলি ছোঁড়া, এই দুনিয়ার চারদিকে দানা ছড়ানো রয়েছে। হাত-পা একটু নাড়, ঠিক খুঁটে খেতে পারবি।'

দশ বছরের ছেলেকে পৃথিবীর কিছু সার কথা শুনিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল হরবিলাস। তারপর থেকে ক্বচিৎ কখনো সে বাড়ি আসত। ছ' সাত মাস পর আসাটা একেবারে ছেড়েই দিয়েছিল।

ফাঁকা বাড়িতে একা-একা থাকতে ভীষণ ভয় করত ফটিকের। সেই সঙ্গে ছিল ভাবনা। সেই দশ বছর বয়সেই পেটের কথা ভাবতে হয়েছিল তাকে। বাপ-মা চলে যাবার পর ঘরের হাঁড়ি-কড়া-বাক্স-টাক্স উল্টে দেখেছিল ফটিক, সব ঢু-ঢু ; কিছু নেই।

তখন আর কী করা, ফটিক সকাল-দুপুর-সন্ধ্যে বেরিয়ে পড়ত। প্রথম প্রথম সে খাবার দোকান, তেলেভাজার দোকান কিম্বা হোটেলের সামনে মুখ কালো করে দাঁড়িয়ে থাকত। কিন্তু কেউ ফিরেও তার দিকে তাকাত না। শেষ পর্যন্ত খিদের জ্বালায় সে চাইতে শুরু করেছিল। তখন কেউ হয়তো তাকে কিছু দিত, কেউ কথাই বলত না, কেউ আবার গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিত।

কিছুদিনের ভেতরেই ফটিক বুঝতে পেরেছিল এভাবে ভিখিরির মতো বেঁচে থাকা তার পক্ষে সম্ভব না। তার মধ্যে একটা স্বাধীন আত্মমর্যাদাওয়ালা মানুষ ছিল ; সে তাকে আর ভিক্ষে করতে দিতে চাইল না।

ফটিক এবার বাজার পাড়ার দরজায় দরজায় ঘুরে বলেছিল, 'আমায় একটা কাজ দেবেন ?' কাজ সে পেয়েও গিয়েছিল। প্রথম দিকে এক বাড়িতে চাকরের কাজ করত ফটিক ; বছর দুই পর চায়ের দোকানে কাপ প্লেট ধোবার কাজ জুটেছিল। কিছুদিন সাইকেল-রিক্সাও চালিয়েছে ; পাঞ্জাবীদের মোটর গ্যারেজেও কাজ করেছে বছর খানেক। কিন্তু কোথাও ভাল লাগেনি ফটিকের ; পান থেকে চুনটি খসলেই মার ধোর, বাপ-মা তুলে গালাগাল আর খিস্তি। বাইরের জগৎ সম্বন্ধে ফটিকের অভিজ্ঞতা খুব খারাপ।

মাঝে মধ্যে বাবার সঙ্গে রাস্তাঘাটে দেখা হয়ে যেত, আরো

লক্ষ্মীছাড়া মার্কা হয়ে গিয়েছিল হরবিলাস। চোখ দু-ইঞ্চি ভেতরে ঢুকে, গাল ভেঙে, কণ্ঠা আর কাঁধের হাড় ঠেলে বেরিয়ে তার চেহারাখানা চুরমার করে দিয়েছিল। মনে হত খুব বেশিদিন আর সে বাঁচবে না।

দেখা হলে হরবিলাস বলত, 'লোকের মুখে শুনি কাজকম্মো করছিস ; দানা খুঁটে খেতে শিখেছিস। ভালো-ভালো—'

ফটিক কিছু বলত না ; তার মুখ শক্ত হয়ে উঠত।

হরবিলাস আবার বলত, 'এ্যাই ফটকে, গোটা দুই টাকা ধার দিতে পারিস ?'

কর্কশ গলায় ফটিক বলত, 'না '

'দে না, সাতদিন পর ফেরত দিয়ে দেব।'

'না।'

'আমার কথা বিশ্বাস করছিস না ?'

'না।'

'তা হলে আর কী হবে ; আচ্ছা চলি—' সামনের দিকে ঝুঁকে পা টেনে টেনে চলে যেত হরবিলাস।

আরো কিছুদিন পর ফটিক খবর পেয়েছিল তার বাবা রেল-স্টেশনের কাছে যে গুমটি ঘরটা আছে সেখানে মরে পড়ে আছে।

ফটিক তাকে দেখতে যায় নি ; শ্মশানে নিয়ে যাওয়া বা শ্রাদ্ধ কিছুই করে নি। পরে সে শুনেছে লাশকাটা ঘরের ডোমেরা হরবিলাসকে তুলে নিয়ে গেছে। নিয়ে গেছে তো গেছে, তা নিয়ে ফটিকের মাথা ব্যথা নেই।

মনুষ্য জাতির প্রতিনিধি হিসেবে প্রথম যে দু'জনকে ছেলেবেলা থেকে সে দেখে এসেছে তারা তার বাবা আর মা। তারা ফটিকের মনে এমন চিরস্থায়ী ছাপ মেরে দিয়েছিল, যেটা কোন দিনই উঠবার

নয়। এরা দু'জন ফটিককে কঠোর শ্রদ্ধাহীন কর্কশ রুক্ষ বেপরোয়া করে তুলেছিল।

ফটিক তার বাবাকে ঘৃণা করত কিন্তু মার সম্বন্ধে ছিল দুরন্ত অভিমান। বাবা না হয় তাকে নরকে ঠেলে দিয়েছিল কিন্তু তার কী দোষ ছিল? মারোয়াড়ীর বাচ্চার সঙ্গে চলে যাবার সময় একবার তার কথাটা ভাবল না মা?

মা-বাপ ছাড়া আর যাদের যাদের সংস্রবে ফটিক এসেছে তাদের কারো কাছেই সামান্য স্নেহ-মমতাটুকু পর্যন্ত পায় নি। কাজেই মানুষ সম্বন্ধে তার ধারণা ভাল না। মানুষকে সে শ্রদ্ধা করে না, ভালবাসে না, বিশ্বাসও করে না।

সে যাই হোক, চায়ের দোকানে, মোটর গ্যারেজে, লোকের বাড়িতে কাজ করতে আর ভাল লাগছিল না ফটিকের। প্রথমতঃ মালিকদের নির্দয় ব্যবহার তো ছিলই। তার ওপর মাইনে-টাইনেও ঠিক সময়ে পাওয়া যেত না।

ফটিক এমন একটা চাকরি খুঁজছিল যাতে মাসের শেষে মাইনেটা অন্তত সঠিক তারিখে পাওয়া যায়। রাজানগর কারখানা-শহর। সময় পেলেই চটকলে, কাঁচকলে, রঙের কারখানায় চাকরির জন্য হানা দিত ফটিক। কিন্তু না আছে তার চেনা-শোনা, না সুপারিশের জোর। শুধু মুখ দেখিয়ে চাকরি পাওয়া কি এতই সহজ!

বাবার মৃত্যুর তিন বছর পর হঠাৎ একটা সুযোগ এসে গিয়েছিল। তখন সে পাঞ্জাবীদের মোটর গ্যারেজে গাড়িটাড়ি ধুত, চাকায় পাম্প লাগাত, মিস্তিরিদের সঙ্গে থেকে থেকে মেরামতির কাজও কিছু কিছু শিখেছিল।

একদিন দুপুরবেলা রাজানগর যখন ঝিম মেরে আছে, পাঞ্জাবী মালিকরা ক্যাশে চাবি দিয়ে খেতে চলে গেছে, গ্যারেজের মিস্তিরিরাও নেই, ফটিক একা-একা বসে গ্যারেজ পাহারা দিচ্ছিল, সেই সময়

একটা অচল স্কুটার ঠেলতে ঠেলতে এক ছোকরা এল। বয়েস চব্বিশ-পঁচিশের মতো। লম্বা লম্বা চুল কায়দা করে পেছন দিকে উল্টে দেওয়া ; লম্বা জুলপি। পরনে দামী ফুলপ্যান্ট, দামী জুতো, কোমরে প্যান্টের খাঁজে রঙীন চশমা গোঁজা। গলায় রুমাল বাঁধা।

ছোকরা জানিয়েছিল, সে কলকাতার দিক থেকে আসছে। যাবে নৈহাটি। কিন্তু রাজানগরের কাছাকাছি এসে স্কুটারের মেশিনে কি একটা গড়বড় হয়েছে ; ফলে গাড়িটা অচল। এখন যদি ফটিক মেশিনের গোলমালটা সারিয়ে দেয় বহুত বহুত উপকার হয়।

কথাবার্তার ঢং এবং সুর শুনে ফটিকের মনে হয়েছিল ছোকরা বাঙালী না। সে বসেছিল, কিন্তু এখন তো মিস্তিরিরা কেউ নেই।

ছোকরা বলেছিল, 'কখন ফিরবে ?'

'সেই বিকেলে।'

'তবে তো বহুত মুসিবৎ। এখুনি আমার নৈহাটি না গেলেই না। আচ্ছা এখানে আর কোন গ্যারেজ-ট্যারেজ আছে ?'

'না।'

ছোকরার চোখমুখের চেহারা দেখে চট করে কিছু একটা ভেবে নিয়ে ফটিক বলেছিল, 'আমি কিছু কিছু জানি, তবে মিস্তিরি না। যদি বলেন স্কুটারের ইঞ্জিনটা খুলে দেখতে পারি।'

ছোকরা প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছিল, জরুর।

ফটিক ইঞ্জিন খুলে ফেলেছিল। গোলমালটা সামান্যই, ওটুকু সারাতে বেশিক্ষণ সময় লাগবার কথা নয়। টুকটুক করে যন্ত্রপাতি নিয়ে যখন সে কাজ করছিল ছোকরা নানা রকম গল্প জুড়ে দিয়েছিল। কথায় কথায় জানিয়েছিল তার নাম ইসমাইল' দেশ বিহারের আরা জেলা, চাকরি করে জাহাজে। কাঁহা প্যাসিফিক, কাঁহা অ্যাটলান্টিক, কাঁহা রেড সী—দরিয়ায় ভেসে ভেসে কত মুল্লুকে যে সে ঘুরে বেড়ায় ! এখন ছুটিতে এসেছে, আছে বেহালার কাছে

মেরিন হোস্টেলে। দিন কুড়ি পর আবার সে জাহাজে উঠবে। এবার যাবে সিঙ্গাপুর, সেখান থেকে জাপান, তারপর আমেরিকা।

ছোকরা আরো জানিয়েছিল, কলকাতা এবং চার পাশে তার প্রচুর রিস্তাদার। যে ক'টা দিন সে ডাঙায় আছে, আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে দেখা করবে। সেদিন নৈহাটিতে এক চাচার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিল, রাস্তায় মেশিন বিগড়ে স্কুটার অচল হয়ে গেছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

ছোকরা দারুণ বকতে পারে। গল্প করতে করতে হঠাৎ সে বলেছিল, 'আমার কথাই তো বলে যাচ্ছি। এবার তোমার কথা বল। এই গ্যারেজে কদ্দিন কাজ করছ?'

'দেড় বছর।'

'কী কাজ করতে হয়?'

'আমি ক্লীনার। গাড়ি-টাড়ি ধুই, গ্যারেজ সাফা করি।'

'তলব কত মেলে?'

'বিশ টাকা।'

'ব্যস!'

'হ্যাঁ।'

'তোমার বাড়ি কে থায়?'

'এখানেই।'

'বাড়িতে আর কে আছে?'

'কেউ না।'

'স্রিফ একেলা?'

'হ্যাঁ।'

ইসমাইলের সঙ্গে বকতে বকতে স্কুটার সারানো হয়ে গিয়েছিল। ফটিক বলেছিল, 'এই নিন—'

ইসমাইল বলেছিল, 'হো গয়া।'

'হ্যাঁ।'

'বহুত আচ্ছা—কত দিতে হবে?

'কি আবার দেবেন, কিছু দিতে হবে না। একটুখানি তো মোটে কাজ।'

ইসমাইল অবাক হয়ে গিয়েছিল, 'তুমি বহুত তাজ্জবের আদমী—'

ফটিক উত্তর দেয় নি।

অনেক বার বলে বলেও যখন ফটিককে কিছু নেওয়াতে পারল না তখন খাবারের দোকান থেকে এক গাদা মিষ্টি-টিষ্টি কিনে এনেছিল ইসমাইল, কাছাকাছি একটা রেষ্টুরেণ্টে চা দিতে বলে এসেছিল।

ইসমাইল বলেছিল, 'পয়সা তো নেবে না, মিঠাই-টিঠাই না খেলে কিন্তু ছাড়ছি না।'

ফটিক বলেছিল, 'ঠিক আছে, খাচ্ছি—'

খেতে খেতে ইসমাইল জিজ্ঞেস করেছিল, 'তলব তো পাও বিশ রুপাইয়া, তার উপর সাধু মহাত্মাদের মতো কাজ করেও পয়সা নাও না। তোমার চলে কি করে?'

অচেনা ওই জাহাজী ছোকরাটিকে মোটামুটি ভালই লেগে গিয়েছিল ফটিকের। এরকম সহৃদয় দিলওলা সজীব মানুষ আগে আর কখনও ছাখে নি সে।

ফটিক বলেছিল 'ওর মধ্যেই চালিয়ে নিই।'

'এ ঠিক বাত নেহি।'

কিন্তু কী 'করব, এর চাইতে ভাল চাকরি আমাকে কে আর দেবে!'

একটু চিন্তা করে ইসমাইল বলেছিল, 'জাহাজে নোকরি করবে? ভালো তলব মিলবে।'

ফটিক বলেছিল, 'দেবে কে?'

'এক কাজ কর, আমি তো এখন বিশ রোজ কলকাতায় আছি। কাল সুবেতে মেরিন হোস্টেলে একবার আসতে পারবে?' বলে বেহালার ঠিকানা দিয়েছিল ইসমাইল।

কি ভেবে ফটিক বলেছিল, 'যাব।'

'জরুর আসবে। আমি তোমার জন্যে ইন্তেজার করব', স্কুটারে উঠে একটু পর চলে গিয়েছিল ইসমাইল।

পরের দিন সত্যিসত্যিই বেহালার মেরিন হোস্টেলে গিয়ে ইসমাইলের সঙ্গে দেখা করেছিল ফটিক। তাকে দেখে ইসমাইল ভারি খুশী, আরে ইয়ার, তুম সাচমুচ আ গিয়ে, বহুত আচ্ছা!

কিছুক্ষণ গল্প টল্প করে তাকে নিয়ে ইসমাইল জাহাজী অফিসে গিয়েছিল। ছোকরা দারুণ কাজের ও জানাশোনাও তার প্রচুর। সেইদিনই মার্চেন্ট নেভিতে একটা ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। ছ'মাসের ট্রেনিং; তারপর চাকরি পাওয়া যাবে।

দিন কয়েক পর গ্যারেজের কাজ ছেড়ে রাজানগরের বাড়িতে তালা ঝুলিয়ে কলকাতায় চলে এসেছিল ফটিক। সঙ্গে ছোট্ট আধভাঙা পুরনো টিনের সুটকেশ আর চিটচিটে চাদর জড়ানো একটা বালিশ।

মার্চেন্ট নেভির ট্রেনিং শিপ 'ভদ্রা'য়, ছ'মাস ট্রেনিং নেবার পর ব্যাঙ্ক লাইনের জাহাজে চাকরি পেয়ে গিয়েছিল ফটিক, স্টোকারের চাকরি।

'ভদ্রা' জাহাজে ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করে দিয়ে সেই যে ইসমাইল চলে গিয়েছিল, আর কোনদিন তার সঙ্গে দেখা হয় নি। ভুস করে কোত্থেকে একদিন ছোকরা এল, তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে গেল ভাবতেও এখন অবাক লাগে। জীবনে এই একটা মাত্র লোক যার সম্বন্ধে মনে মনে মোটামুটি একটু শ্রদ্ধা আছে ফটিকের।

যাই হোক জাহাজে চাকরি নেবার পর দারুণ বেপরোয়া হয়ে

উঠেছিল ফটিক। তার জীবনে কোন মোহ নেই, আকর্ষণ নেই, আনন্দ নেই। নেই বিন্দুমাত্র পিছুটান। কথায় কথায় সে মারামারি বাধিয়ে দিত। একটানা দিনের পর দিন নোনা জলে ভেসে থাকার পর যখন তাদের জাহাজ কোন বন্দরে ভিড়ত, ফটিক খুঁজে খুঁজে প্রথমেই গিয়ে হাজির হত বেশ্যাবাড়িতে কিংবা মদের দোকানে। বাপ-মা থেকে শুরু করে পৃথিবীর সব মানুষকে অশ্রদ্ধা করে ঘৃণা করতে করতে তার মনটা পোড়া ঝামার মতো কর্কশ আর শক্ত হয়ে উঠেছিল। স্নেহ প্রীতি ভালবাসা, এই সব স্নিগ্ধ কোমল দিকগুলো তার মধ্যে ফুটে ওঠার সুযোগই পায় নি। এমন কি নিজের সম্বন্ধেও তার মমতা ছিল না জীবনটাকে যাচ্ছেতাই ভাবে উড়িয়ে দিচ্ছিল ফটিক, নিজেকে ভেঙেচুরে ধ্বংস করে ফেলছিল।

মাইনে-টাইনে যা সে পেত, কিংবা এক পোর্ট থেকে আরেক পোর্টে মাল স্মাগল করে যা লাভ হত, সবই বেশ্যাবাড়ি আর বিদেশী তাড়ির দোকানে দোকানে ঢেলে দিয়ে আসত। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা উড়িয়ে নগদ দগদগে একটি সিফিলিস জুটিয়ে ফেলেছিল ফটিক। নিয়মিত পেনিসিলিন নিলে সেটা কিছুদিনের জন্য চাপা পড়ে, পেনিসিলিন বন্ধ করলেই আবার ঠেলে বেরোয়। রোগটা একেবারে হাড়ের তলায় অব্দি পৌঁছে গেছে।

দু-তিন বছর পর পর তাদের জাহাজ কলকাতায় ফিরলে পোর্টে নেমে সোজা রাজানগর চলে যেত ফটিক। সেখানে নিজেদের বাড়িতে কতক্ষণ আর থাকত! রাজানগরের মেয়েপাড়ায় তার বেশির ভাগ সময় কাটত। আসলে বেশ্যা আর মদ তার নিঃশ্বাসের মধ্যে মিশে গেছে।

এই মেয়েপাড়াতেই তার সঙ্গে পেনোর আলাপ। পেনো রাজানগরের বেশ্যাদের দালাল। মেয়েদের জন্য ফুসলে ফাসলে খদ্দের জুটিয়ে আনতে পারলে ভাল কমিশন পায় সে। এই তার জীবিকা।

পেনোর বাড়ি রাজানগরে নয় ; কোথেকে কবে যেন স্রোতের মুখে আবর্জনার মতো ভাসতে ভাসতে বেশ্যাপাড়ায় এসে সে আটকে গিয়েছিল। ওখানেই থাকে সে ; আড়কাঠিগিরি করাই তার জীবিকা।

ফটিক যেদিন প্রথম রাজানগরের মেয়েপাড়ায় এসেছিল সেদিনই পেনোর সঙ্গে আলাপ। ছোকরা মন্দ না। দু-চারটে পয়সা দিলে কিংবা এক ভাঁড় তাড়ি খাওয়ালে তাকে দিয়ে না করানো যায় এ রকম কাজ নেই, জুতোর তলা পর্যন্ত চেটে দিতে পারে সে। ফটিক রাজানগরে এলেই পেনো তার গায়ে জোঁকের মতো আটকে যায়।

মেয়েপাড়ায় যাতায়াত করতে করতে পেনোর সঙ্গে খানিকটা ঘনিষ্ঠতাই হয়ে গেছে ফটিকের।

হাঁটতে হাঁটতে শহরের সীমানা ছাড়িয়ে ফটিক আর পেনো অনেকটা চলে এসেছিল। এখন রাস্তার দু' ধারে যতদূর চোখ যায় ; ফাঁকা জায়গা। সেখানে ধানক্ষেত, হোগলা বন, খাল, খালের ওপর বাঁশের সাঁকো ; সাঁকোর মাথায় মাছরাঙা। এই হেমন্তেও ধান ক্ষেতে হোগলা বনে বেশ জল আছে।

ফাঁকা জায়গাটা পেরুলেই ইতির পর পুনশ্চর মতো আরো কিছু দোকানপাট আর বস্তি চোখে পড়ে। দোকানগুলো ডান ধারে, বস্তিটা বাঁ দিকে। দোকান বা বস্তিটস্তি সবই খোলার চালের। দোকানগুলোর কোনটা মুদিখানা, কোনটা পানবিড়ির, কোনটা চা-বিস্কুট মামলেটের, তিন চারটে তেলেভাজার। এদের গা ঘেঁষেই একটা কবিরাজখানা, ভাঙা রঙচটা টিনের সাইন বোর্ডে লেখা আছে 'সঞ্জীবনী আয়ুর্বেদ ভবন', তার তলায় প্রোপ্রাইটর : শ্রীশশিভূষণ সেন, ভিষকরত্ন'। কবিরাজখানার পর একটা খেলো ফটো তোলার

দোকান। তারপর শুঁড়িখানা অর্থাৎ দিশী মদের দোকান। বাঁদিকের বস্তিটা হল রাজানগরের মেয়েপাড়া।

দোকানপাট আর বস্তি পেছনে ফেলে আরেকটু এগুলে উঁচু বাঁধ। বাঁধের নিচে শ্মশান ; শ্মশানের তলায় গঙ্গা।

ফটিক আর পেনো মেয়েপাড়ার কাছে এসে পড়ল।

সূর্যটা টাল খেয়ে আকাশের মাঝ-মধ্যিখান থেকে পশ্চিমে কিছুটা নামলেও দুপুরের জের এখনও চলছে। বাজারপাড়ার মতো এখনকার বেশির ভাগ দোকানপাটের ঝাঁপও বন্ধ ; শুধু চায়ের দোকানগুলোতে উনুনে বড় বড় সিলভারের হাঁড়িতে আস্ত মটর সেদ্ধ হচ্ছে ; সন্ধ্যের দিকে এগুলো ঘুগনি হয়ে দিশী মদের চাট হয়ে যাবে।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ফটিক। দ্রুত চারদিকটা এক পলক দেখে নিয়ে বলল, 'জায়গাটা সেই রকমিই রয়েছে দেখছি।'

ঘাড়ের পাশ থেকে পেনো বলে উঠল, 'হ্যাঁ গুরু—'

'ফটোর দোকানের মন্মথটা এখনও আছে রে ?'

'এই ভাগাড় ছেড়ে আর কোন চুলোয় যাবে ?'

'আর শশে কববেজ ?'

'সে শুকনিটাও আছে।'

'মালের দোকানের বেন্দাবন ?'

'আছে আছে ফটকেদা ; সব শালাই আছে। সন্ধ্যেবেলা গত্ত থেকে মাকড়ারা কেমন বেরোয় দেখবে'খন। এখন এসো তো গুরু—'

'হ্যাঁ চল—'

যেতে যেতে পেনো আবার বলল, 'এ শালার এমন জায়গা, চিতেয় না ওঠা পর্যন্ত কেউ নড়বে না। গুড়ের গায়ে মাছির মতো আটকে থাকবে।'

'যা বলেছিস ব্লাডি ব্যাস্টার্ড!' খ্যাল খ্যাল করে হেসে পেনোর

ঘাড়ে একটা থাবড়া কসিয়ে দিল ফটিক। গুড়ের গায়ে মাছির উপমাটা তার খুব ভাল লেগেছে।

থাবড়া খেয়ে পেনো ধনুকের মতো বেঁকে গিয়েছিল। নাকের ভেতব থেকে সরু একটা শব্দ বার করে ককিয়ে উ'ল, 'উ-হু-হু, ঘাড়ের হাড় ঢিলে হয়ে গেল ফটাকেদা—'

'আদর করলাম, তাতেই হাড্ডি আলগা হয়ে গেল! শালা ফুলের ঘায়ে মুচ্ছো গেলি যে রে—'

মেয়েপাড়াটা রাস্তা থেকে খানিকটা নিচে। রাস্তার গায়ে খাঁজ কেটে কেটে সিঁড়ি বানানো হয়েছে।

আগে আগে পেনো, পেছনে ফটিক—খাঁজকাটা সিঁড়ি ভেঙে ওরা মেয়েপাড়ায় ঢুকে পড়ল।

এখন যদিও ঠিক ভরদুপুর নয়, তবু মেয়েপাড়াটার ওপর দারুণ এক আলসেমি ভর করে আছে। বেশির ভাগ ঘরেরই দোর বন্ধ; মেয়েরা হয়তো ঘুমোচ্ছে। দু-একজন বারান্দার খুঁটিতে হেলান দিয়ে হেমন্তের ঢিমে রোদে চুল শুকিয়ে নিচ্ছিল।

একটা লম্বাটে ধরনের ঢালা উঠোনকে ঘিরে সারি সারি ঘর। পেনোরা উঠানে এসে পড়েছিল।

ফটিক চাপা নিচু গলায় বলল, 'সেই কথাটা মনে আছে তো?

পেনো শুধলো, 'কোন্‌টা?'

'সেই যে, ছুঁড়িটা যদি দারুণ না হয় তোকে জানে বাঁচতে হবে না!'

'মনে আছে গুরু, মনে আছে। এসে তো পড়েছই; নিজের চোখেই দ্যাখো না—' বলতে বলতেই চিলের মতো চেঁচিয়ে উঠল পেনো, 'মাসি—অ মাসি—'

বারান্দায় বসে যে দু-একটা মেয়ে চুল শুকোচ্ছিল, চমকে ঘাড়

ফিরিয়ে তাকাল। দুপুরও না, বিকেলও না, এই অবেলায় পেনোর সঙ্গে নতুন একজনকে এ পাড়ায় ঢুকতে দেখে তারা অবাক।

আর পুবদিকের ঘর থেকে চোখ রগড়াতে রগড়াতে লক্ষীছাড়া চেহারার কুৎসিত মাঝবয়সী একটা মেয়েমানুষ বেরিয়ে এল। তার নাম মানদা। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ গলায় কদর্য একটা খিস্তি আউড়ে সে বলল, 'নচ্ছারের ব্যাটাকে যেন বাঘে ধরেছে লো।' দুপুরের কাঁচা ঘুমটির বারোটা বাজায় সে খুবই বিরক্ত। এই মেয়েপাড়ার বাড়িওলী সে।

দারুণ উৎসাহের গলায় পেনো বলল, 'দেখ দেখ মাসি কাকে নিয়ে এসেছি।'

চোখ রগড়ানো হয়ে গিয়েছিল। মানদা পেনোর সঙ্গে ফটিককে দেখে কয়েক পলক তাকিয়ে থাকল। তারপর গলার স্বরে খুশী আর বিস্ময় মিশিয়ে বলল, 'আমার ফটকে বাবা না?'

ফটিক হাসল, হ্যাঁ গো মাসি; আমি সেই ব্লাডি সোয়াইন ফটকেই—'

মানদা বলল, 'আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলুম গো—'বলতে বলতে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'এসো, বাবা এসো—' ছুটে গিয়ে নিজের ঘর থেকে একটা বেতের মোড়া এনে বারান্দায় পেতে দিতে দিতে বলল, 'বোসো—'

পেনো ষ্টীলের বাক্সটা বারান্দায় নামিয়ে রেখেছিল. কাঁধ থেকে বিছানাটা বাক্সটার ওপর রেখে মোড়ায় বসল ফটিক।

পেনো দাঁত বার করে মানদাকে বলল, 'খুব তো বাপ-মা তুলে গাল দিলে, এখন?'

মানদা নরম গলায় বলল, 'আমার ফটকে বাবা যে এয়েছে কি করে জানব বল্। সত্যি বাপু কাঁচা ঘুমটা ভস্তাতে আমার রাগ হয়েছিল।'

,তোমার বাবাকে দেখে এখন রাগ জল হয়ে গেছে তো ?'

সিলভারের কৌটো থেকে দাঁতে তামাকের গুঁড়ো লাগাতে লাগাতে ঘাড় কাত করল মানদা, 'হ্যাঁ।'

পেনো বলল, 'মাঝখান থেকে আমার বাপ-মা উদ্ধার হয়ে গেল

সেই মেয়ে দুটো আপাতত চুল শুকনো মুলতুবি রেখে উঠে এসেছিল। তাদের একজনের নাম সরলা, আরেকজন পদ্ম। খসখসে অমসৃণ চামড়া, রঙ কালচে! এককালে একটু-আধটু লাবণ্য হয়তো ছিল। এই মেয়েপাড়ায় রাতের পর রাত জেগে আর মাতাল লম্পটদের অত্যাচার সয়ে সয়ে লাবণ্য-টাবণ্য আর নেই, শরীরও গেছে।

মেয়েদুটো ফটিকের চেনা; বছর দুয়েক আগে যখন এসেছিল তখন দেখে গেছে। ফটিককে দেখে ওরা খুব খুশী; মুখচোখ দেখে অন্তত তাই মনে হয়। ওদের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল ফটিক।

মানদা ফটিকের মুখোমুখি বসে পড়েছিল। বলল, ,এ বার দু-বছর পর এলে; এ্যাদ্দিন পর মাসিকে মনে পড়ল!'

ফটিক বলল, কী করব, জলে ভাসার চাকরি। জাহাজ কলকাতায় না এলে তো আসতে পারি না।

পেনোও ফটিকের গা ঘেঁষে বারান্দার মেঝেতে বসে পড়েছিল। সে বলল, 'জানো মাসি, ফটকেদাদের পঞ্চাননতলার বাড়িটা গেল বছর ঝড়ে শুয়ে পড়েছে, তোমায় বলেছিলুম না।'

'হ্যাঁ, মানদা মাথা নাড়ল।'

'তাই শুনে ফটকেদা ফিরে যাচ্ছিল।'

'ফিরে যাবে কেন; আমরা আছি না।'

'সেই জন্যেই তো ধরে আনলুম গো মাসি—'

'খুব ভাল করেছিস।' বলতে বলতেই ফটিকের দিকে ফিরল মানদা, 'তা কেমন আছো বল বাবা'।

ফটিক এদিক-ওদিক তাকিয়ে কাকে যেন খুঁজছিল ; খুব সম্ভব পেনোর বর্ণনার সেই মাথা-ঘুরিয়ে-দেওয়া দারুণ ছুঁড়িটাকে। কিন্তু কোথাও তাকে দেখা যাচ্ছে না। ফটিক অন্যমনস্কের মতো বলল, 'ভালই আছি।'

আবার কি বলতে যাচ্ছিল, মানদার হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল, 'অই ছ্যাখো, আমি একা-একাই বকে মরছি, ছুঁড়িগুলোকে ডাকি। ওরা তোমার জন্যে একেবারে পাগল।' বলতে বলতেই ওখান থেকে চেঁচিয়ে উঠল, 'কই লা ছুঁড়িরা ঘুম-টুম পুঁটলিতে বেঁধে দেখবি আয় কে এয়েছে।'

চারপাশের ঘর থেকে চোখ রগড়াতে রগড়াতে আর হাই তুলতে তুলতে একজন একজন করে পনের ষোলটি মেয়ে বেরিয়ে এল। সবই চেনা মুখ, দু'বছর তিন বছর চার বছর যত কাল ধরে ফটিক এ পাড়ায় যাওয়া-আসা করছে এই মেয়েদের দেখে আসছে। লাবণ্য-হীন কুৎসিত চেহারা মেয়েগুলোর। তাদের কারো নাম চাঁপা, কারো টগর, কারো মালতি, সন্ধ্যা, জবা, টুলি, পাখি ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু পেনো যা বলেছে তেমন কোন মেয়েকে এদের মধ্যে দেখা গেল না।

মেয়েগুলো কাছাকাছি এসে মাছির মতো ভন ভন করতে লাগল

'কবে এলে গো।'

'কদ্দিন ধরে তোমার জন্যে আমরা হেদিয়ে মরছি।'

'আমরা ভাবলুম, বুঝি লাগর আমাদের ভুলেই গেছে।'

ইত্যাদি ইত্যাদি নানা ধরনের কথা বা মন্তব্য।

ওদের ভেতর থেকে একটি মেয়ে, টগর বেরিয়ে এসে হাঁটু ভেঙে ফটিকের পা ছুঁয়ে প্রণাম করল।

ফটিক তড়াতাড়ি তার মাথায় হাত ঠেকিয়ে বলল, 'ভাল আছিস টগর?'

টগর একমুখ হাসল, 'পাঁকের মধ্যে পড়ে আছি ভালোদাদা। আমাদের আর ভালো থাকাথাকি।'

প্রথম যেদিন ফটিক এ পাড়ায় আসে তখন থেকেই টগরের সঙ্গে তার ভাই-বোনের সম্পর্ক। টগর তাকে বলে ভালোদাদা। বার দুই ভাই ফোঁটার সময় রাজানগরে থেকেছে ফটিক; টগর তাকে ফোঁটা দিয়েছে।

টগর আবার বলল, মাসের পর মাস জলে জলে ভেসে থাকো আমার না এমন ভয় করে ভালোদাদা!'

ফটিক আবছা ভাবে হাসল।

এই সময় একটা মেয়ে, তার নাম চাঁপা, বলে উঠল, 'এবার কদ্দিনের ছুটি নিয়ে এয়েছ গো?'

ফটিক বলল, 'মাসখানেক।'

'এই একটা মাস আমার কাছে থাকবে।'

অমনি আরেকটা মেয়ে ফোঁস করে উঠল, 'গেল বার এসেও তোর কাছে ছিল; এবার আমার কাছে থাকবে।'

ওধার থেকে কাকের মতো কর্কশ ধারালো গলায় জবা বলে উঠল, 'ও তোর কতকালের ভাতার লা; ও থাকবে আমার কাছে—'

ফটিককে নিয়ে মেয়েদের মধ্যে কামড়াকামড়ি টানাটানিটা এমনি এমনি নয়। তার কারণ হল ফটিক দু' হাতে দেদার টাকা ওড়ায়। যে মানুষ বেপরোয়া হয়ে খরচ করে তাকে হাতে রাখার লাভ আছে তাই দু-একবছর পর পর ফটিক এপাড়ায় এলে তাকে নিয়ে মেয়েদের মধ্যে দারুণ প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়।

মেয়েগুলোর মধ্যে যখন কাড়াকাড়ি চলছে সেই সময় উত্তর দিকের একটা ঘর থেকে মেয়েটি বেরিয়ে এল।

তার বয়েস চব্বিশ-পঁচিশের মধ্যে। গা ভর্তি স্বাস্থ্য। মুখখানা প্রতিমার কথা মনে পড়িয়ে দেয়। পাতলা টিকলো নাকের দু-ধারে

বড় বড় চোখ, পিঠময় ছড়ানো থাক থাক কালো কুচকুচে চুল ; হাত, হাতের আঙুল, চোখ তার সব কিছুতেই লম্বা টান দেওয়া। তার সারা গায়ে অনেকখানি লাবণ্য এখনও মাখামাখি হয়ে আছে।

গোটা তুনিয়ার হাজারটা বেশ্যাপাড়ায় ঘুরে বেরিয়েছে ফটিক। কিন্তু ব্লাডি হেলের মধ্যে এরকম একটা মেয়ে যে থাকতে পারে, কে ভাবতে পেরেছিল!

ঘাড়ের পাশ থেকে চাপা ঘড়ঘড়ে গলায় পেনো বলে উঠল ; 'এখানে আসতে আসতে যার কথা বলেছিলুম? মিলিয়ে নাও ফটকেদা ; ঠিক বলেছিলাম, না বেঠিক ?'

এদিকে মানদা মেয়েটার দিকে তাকিয়ে খাতিরের সুরে বলল, 'এতক্ষণে তোর ঘুম ভস্তাল টিয়া! আয় আয় দ্যাখ কে এয়েছে—'

মেয়েটার নাম তা হলে টিয়া ? ফটিক একদৃষ্টে তাকিয়েই থাকল।

টিয়া কাছে এসে মানদার গা ঘেঁষে বসল। মানদা ফটিককে দেখিয়ে বলল ; 'এই আমার বাবা ফটিক। মস্ত লোক, কালাপানিতে, ভেসে ভেসে জাহাজে করে কোথায় কোথায় চলে যায়'।

অন্য মেয়েরা ফটিককে নিয়ে এখনও সমানে ঝগড়া চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের চেঁচামেচিতে কানের পর্দা ফেঁসে যাচ্ছে।

একটি মেয়ে তার নাম কুসুম, এর ভেতর বলে উঠল, 'একা কারু ঘরে থাকবে না ; তু'দিন করে সবার ঘরে থাকবে'।

মানদা কুৎসিত খিস্তি করে গর্জে উঠল, 'এ্যাই মাগীরা, এ্যাই কাগের বাচ্চারা—চেল্লানি থামা। আর একটা কথা শুনলে গলায় চ্যালাকাঠ পুরে দেব।' সে যে বাড়িউলি, রাজানগরের এই মেয়ে-পাড়াটার সর্বময় কর্ত্রী—ওই একটা গর্জনেই টের পাইয়ে দিল।

মেয়েগুলো থমকে গেল। তারপর চেঁচামেচি থামিয়ে চুপচাপ ফটিকদের চার পাশে এলোমেলো বসে পড়ল।

মানদা গলার স্বর একটু নামিয়ে আবার বলল, 'ছেলেটা এ্যাদ্দিন পর সবে এল। ঘরে পা দিতে না দিতেই শুকুনির ছানারা তার মাংস ছিঁড়ে খাচ্ছে লা!'

কুসুমের দিকে ফিরে বলল, 'সব্বার ঘরে দু'দিন দু'দিন করে থাকবে না! কালনিমির নঙ্কা ভাগ হচ্ছে!'

কুসুম ভয়ে ভয়ে বলল, খেয়োখেয়ির চাইতে ভাগ করে নেওয়া ভাল না—তুমিই বল মাসি?'

'তুই থাম ছুঁড়ি। ভাগাভাগি করছে! আমার বাবা বিলেত ফেরত—আমি তাকে যার হাতে তুলে দোবো, এবার সে পাবে।'

'কার হাতে তুলে দেবে?'

'আর যার হাতেই দিই, তোর হাতে নয়। কার হাতে দেবো—সে আমি বুঝব। ভেবে ভেবে তোর মাথা খারাপ করতে হবে না।'

ফটিক একদৃষ্টে, প্রায় পলকহীন, টিয়ার দিকে তাকিয়ে ছিল। মানদা বা অন্য মেয়েদের চেঁচামেচি চিৎকার সে যেন স্পষ্ট করে শুনতে পাচ্ছিল না; আবছাভাবে কতকগুলো শব্দ শুধু তার কানে ধাক্কা দিয়ে যাচ্ছিল।

এ দিকে ঘাড়ের কাছে মুখ গুঁজে পেনো চাপা নিচু গলায় মাছির মতো ঘ্যান ঘ্যান করে যাচ্ছিল, 'কি ফটকেদা পসন্দ্ হুয়া—পসন্দ্ হুয়া?'—শালা মাকড়াটা খুশিতে ডগমগ হয়ে মাঝেমধ্যে হিন্দী আওড়াতে থাকে।

যতবার ঘাড়ের কাছে পেনো মুখ আনছিল ততবারই কনুই দিয়ে তাকে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছিল ফটিক।

অন্য মেয়েরা বসে পড়েছে। টিয়া কিন্তু বসেনি; বারান্দার একটা খুঁটিতে হেলান দিয়ে শরীরে দু-তিনটে বাঁক তৈরি করে দাঁড়িয়ে ছিল আর ফটিককে দেখছিল। তার চোখেমুখে কিছু বিস্ময়, কিছু কৌতূহল।

অন্য মেয়েদের ঠাণ্ডা করবার পর এবার মানদার নজর পড়ল টিয়ার ওপর। বলল, 'এ্যাই ছুঁড়ি, তুই দূরে দাঁড়িয়ে কেন লা ? কাছে আয়।' গলার ধরনেই বোঝা যায় টিয়াকে বেশ খাতির করে সে।

টিয়া আস্তে করে বলল, 'সবাই তো কাছে গিয়ে বসেছে ; আমি না হয় দূরেই থাকি।'

মানদা বলল, 'আর ঠ্যাকার করতে হবে না ; আয় ইদিকে—'

কাঁধে আঁচল তুলে দিয়ে টিয়া এবার মানদার কাছে এসে বসল।

ফটিককে দেখিয়ে মানদা বলল, একে চিনিস ?'

টিয়া ঘাড় হেলিয়ে দিল, 'হুঁ—'

'কে বল্ তো ?'

'তোমার বাবা।' টিয়ার বলার ভঙ্গিটা এমনই যে সবাই হেসে ফেলল ; এমন কি ফটিকও।

হেসে হেসে মানদা বলতে লাগল, 'বাবা তো ঠিকই ; এক শো বার বাবা, হাজার বার বাবা। ফটিক আমার চাট্টিখানি লোক না ;জাহাজে হিল্লী-দিল্লী-বিলেত করে বেড়ায়। সাহেবদের সঙ্গে তার ঘোরাফেরা, ওঠা-বসা। দয়া করে যে এখেনে আসে তাতেই আমরা ধন্যি হয়ে যাই।'

চোখের কোণ দিয়ে ফটিককে এক পলক দেখে নিয়ে টিয়া বলল, 'তোমার বাবার কথা শুনে শুনে আমার কান ঝালাপালা হয়ে গেছে গো মাসি। যেদিন থেকে এখানে এসেছি সেদিন থেকেই ওই এক কথা শুনে আসছি। বাবা যেন তোমার জপের মালা।'

মানদা তামাক-লাগানো কালো এবড়োখেবড়ো দাঁত বার করে হাসতে লাগল, 'তা যা বলেছিস।' হাসতে হাসতেই সে ফটিকের দিকে ফিরল, 'কথা শোন মেয়ের। হিংসে, বুঝলে বাবা, তোমার ওপর ছুঁড়ির হিংসে।'

ফটিক উত্তর দিল না, তার সিগারেটে-পোড়া কালো ভারি ঠোঁটে ■াবছা একটু হাসি ফুটেই মিলিয়ে গেল।

মানদা এবার টিয়াকে দেখিয়ে বলল, 'একে নিশ্চয়ই তুমি চিনতে পারছ না?'

ফটিক টিয়াকে দেখতে দেখতে বলল, 'এবার এসে তোমাদের মুখে নামটাই শুনলাম। এছাড়া আর কিছু জানি না। আগে আগে যখন এসেছি তখন একে দেখিও নি।'

'দেখবে আর কোত্থেকে! মাস-তিনেক হল টিয়া এখেনে এয়েছে। আর তুমি শেষবার এসেছিলে দু বছর আগে।'

'তা বটে।'

এই সময় টগর ওধার থেকে বলে উঠল, 'হ্যাঁ গো ভালোদাদা, অন্য বার তুমি এসেই তো খাবারদাবার আনাও; খেতে খেতে গল্প করি। এবার যে শুকনো মুখে বসে আছি দাদার আমার সে হুঁশই নেই।'

তার কাঁধের কাছ থেকে কুসুম বলে উ'ল, 'হুঁশ থাকবে কি করে! টিয়ার মুখ দেখে তোর দাদার মুণ্ডু ঘুরে গেছে যে।'

ফটিক তাড়াতাড়ি পকেট থেকে একটা মোটা মানি ব্যাগ তুলে আনল; তার ভেতর থেকে দশ টাকার একখানা নোট বার করে পেনোকে দিতে দিতে বলল, 'একদম ভুলে গেছলাম রে। যা, চট করে কিছু কিনে নিয়ে আয়।'

'ক' টাকার আনব?'

'ব্লাডি সোয়াইন, দশ টাকারই আনবি। যাবি আর আসবি। যা, ভাগ—'আলতো করে পেনোর ঘাড়ে একটা লাথি কষিয়ে দিল ফটিক।

দশ টাকার নোটটা ভাঁজ করে একটা চুমু খেল পেনো। তারপর ভো-কাট্টা ঘুড়ির মতো উড়তে উড়তে বেরিয়ে গেল।

বিকেল হয়ে এসেছিল। দিনটা আরো নির্জীব হয়ে যাচ্ছে। উত্তুরে হাওয়ায় হিমের ভাব মিশতে শুরু করেছে।

বারান্দায় বসে বসেই ওরা এলোমলো গল্প করে যাচ্ছিল। গল্পের ফাঁকে ফাঁকে ফটিক বার বার টিয়ার দিকে তাকাচ্ছিল। যত বার তাকাচ্ছিল তত বারই টিয়ার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যাচ্ছিল।

আধঘণ্টা লাগল না, পেনো মুড়ি, কাঁড়ি কাঁড়ি তেলেভাজা, ঘুগনি আর জিলিপি-নিমকি-রসগোল্লা নিয়ে ফিরে এল।

মানদা তার ঘর থেকে সরষের তেল, পেঁয়াজ, কাঁচালঙ্কা নিয়ে এল। তেল দিয়ে মুড়ি মেখে লঙ্কা-পেঁয়াজ কুচিয়ে তার ওপর ছড়িয়ে দিল। তারপর সব খাবার সমান ভাগ করে সকলের হাতে হাতে দিল।

খেতে খেতে পেনো বলল, 'কেন যে মাইরি তুমি এক বচ্ছর দু'বচ্ছর সমুদ্দুরে পড়ে থাকো! তুমি এখেনে থাকলে রোজ এইরকম মুড়ি-তেলেভাজা-রসগোল্লা-ফসগোল্লা সাঁটানো যায়।'

'বলছিস!'

'হুঁ-উ উ'—বেগুনিতে লম্বা একটা কামড় দিয়ে পেনো ঘাড়টা অনেকখানি হেলিয়ে দিল।

ফটিক নাক মুখ কুঁচকে প্রশ্রয়ের সুরে বলল, 'শালা ব্রেখোকাঠ!'

পেনো খাবার আনার সময় চায়ের দোকানে বলে এসেছিল। একটা ছোকরা কলাইয়ের থালায় সারি সারি চায়ের গেলাস বসিয়ে নিয়ে এল।

চা আর মুড়িটুড়ি খেতে খেতে আরেক প্রস্থ গল্প চলল। হঠাৎ কী মনে পড়তে তার ভেতরেই ফটিক বলে উটল, 'আজ রাত্তিরে আমি সবাইকে খাওয়াব। বল তোমরা কী খাবে?'

সবগুলো মেয়েই একসঙ্গে বলল, 'মাংস-ভাত, মাংস ভাত—'

ফটিক লক্ষ করল টিয়া কিছু বলল না, মানদা যে মুড়িটুড়ি দিয়েছে সেগুলোও খাচ্ছে না। সে জিজ্ঞেস করল, 'কি হল, খাচ্ছ না যে?'

টিয়া বলল, আমি কেন খেতে যাব ? সম্পর্কটা কী ?'

ফটিক থতিয়ে গেল, 'সম্পর্ক মানে !'

এই সময় মানদা টিয়াকে বলে উঠল, 'খা লো ছুঁড়ি, খা। সম্পর্ক হতে কতক্ষণ।'

পেনো থ্যাসখেসে গলায় হেসে উঠল, 'হয়ে গেল গুরু—'

তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে অন্য মেয়েগুলো হেসে উঠল।

ফটিক মানদার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'তা হলে রাত্তিরে মাংস ভাতই তো হচ্ছে ?' বলেই আড়ে আড়ে একবার টিয়াকে দেখে নিল।

মানদা বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ মাংস-ভাতই হবে।'

পকেট থেকে আবার এক গোছা নোট বার করে পেনোকে দিতে দিতে ফটিক বলল, 'চাল-তেল-মাংস-পেঁয়াজ-গরম মসলা যা যা লাগে সব নিয়ে আসবি, বুঝলি ? ওর থেকে গ্যাঁড়াফাই করবি না'।

পেনো টাকাগুলো পকেটে চালান করে বলল, 'কি যে বল গুরু, গ্যাঁড়ার কারবারে আমি নেই।,

না, তুমি শালা যুধিষ্ঠিরের বাচ্চা।

পেনো ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে বলল, 'হে—হে—'

'আর হে—হে করতে হবে না। ছুটে বাজারে চলে যা—'

'এখন গিয়ে কী করব, খাওয়া-দাওয়া তো রাত্তিরে ; সন্ধ্যেবেলা কিনে আনলেই হবে।'

'তবে তা-ই যাস।'

হাত কচলাতে কচলাতে পেনো এবার বলল, 'একটা কথা কইব ফটকেদা ?'

ফটিক চোখ কুঁচকে তাকাল, 'কী ?'

'শুধু মাংসই খাওয়াবে ; তার সঙ্গে এট্টুস ওষুদ খাওয়াবে না ? ওষুদ নইলে মাংস হজম হবে কি করে ?'

'কিসের ওষুদ ?'

দু হাত দিয়ে একটা বোতলের আকার দেখাল পেনো। ফটিক রগড়ের গলায় বলল, 'ওরে শালা খচড়া, এই তোর ওষুদ !'

'হ্যাঁ ফটকেদা—'

ফটিক বলল, 'আলবত ওষুদ খাওয়াব। সন্ধ্যেবেলা যখন মাংস-ফাংস আনতে যাবি তিনটে বাঙলা মালের বোতলও নিয়ে আসিস।'

'ফটকেদা, মাইরি তোমার জবাব নেই '

এই সময় কি মনে পড়ে গেল মানদার। সে বলে উঠল, 'এ্যাই পেনো, আমার বাবা এয়েছে। দেখবি আজ যেন সন্ধ্যের পর এ পাড়ায় কোন মড়া না ঢোকে। আজ মেয়েপাড়ার দোর বন্ধ, বুঝলি ?'

এক বছর কি দু'বছর পর পর ফটিক যেদিন রাজানগরের মেয়ে-পাড়ায় আসে সেদিনটা এখানে উৎসবের দিন। তার সম্মানে বাড়িউলি সেদিন আর কোন খদ্দেরকে ঢুকতে দ্যায় না। ক'বছর ধরে এটাই নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে।

পেনো ঘাড় কাত করে জানাল, সন্ধ্যে হলেই সে সদর দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াবে ; একটা মাছিও গলতে দেবে না।

সবার চা এবং মুড়ি-টুড়ি খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। এদিকে দিনটা দ্রুত ফুরিয়ে রোদের রঙ এখন বাসি হলুদের মতো। সূর্যটা অনেক দূরে গঙ্গার ওপারে আকাশের ঢালু পাড় বেয়ে বেয়ে নেমে গেছে। একটু পরেই ঝপ করে হেমন্তের সন্ধ্যে নেমে আসবে।

মেয়েদের মধ্য থেকে টগর বলল, 'হ্যাঁ গো ভালোদাদা—'

ফটিক তার দিকে ফিরল, 'কী বলছিস ?'

'অন্য বার জাহাজ থেকে ফিরলে সমুদ্দুরের গল্প কর, যে যে দেশে যাও সেই সেই দেশের গল্প কর। এবার তো কিছু বলছ না !'

ফটিক বলল, 'বলব বলব, সবে তো এলুম। রাত্তিরে কত গল্প শুনতে পারিস, দেখব।'

মানদা বলল, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ গল্প-টপ্প রাত্তিরেই হবে। এখন আর ছেলেটাকে বকিয়ে মারতে হবে না।' ফটিককে বলল, 'তুমি এখন একটু জিরিয়ে নাও বাবা। সেই কখন জাহাজ থেকে নেমেছ—'

ফটিক বলল, 'জিরোবার দরকার নেই। এই জামাপ্যান্টগুলো একটু পাল্টাতে পারলে হত। পনের দিন আগে আমাদের জাহাজ যখন সিঙ্গাপুরে তখন এগুলো পরেছিলাম। ঘামে নোংরায় একেবারে চটচটে হয়ে গেছে। তা ছাড়া একটু চান করব - '

মানদা ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'নিশ্চয়ই চান করবে।' ঠোঁট কামড়ে কি একটু ভাবল সে; তারপর টিয়াকে দেখিয়ে বলল, 'দেখ তো বাবা, একে মনে ধরে নাকি?'

সবার সঙ্গেই কথা বলছিল ফটিক, কিন্তু ঘুরে ফিরে তার চোখ বার বার টিয়ার ওপর গিয়ে পড়ছিল। মানদার কথায় এবার স্থির চোখে টিয়াকে দেখতে লাগল সে। কিন্তু কিছু বলল না।

ও পাশ থেকে পেনো ফিসফিসিয়ে বলল, 'ধরেছে গো মাসি, ধরেছে। দেখছ না, টিয়াকে দেখতে দেখতে গুরুর চোখের পাতা পড়ছে না, একদম ফিক্সড হয়ে গেছে।'

পেনোর ঘাড়ে একটা ঠ্যাং তুলে দিয়ে ফটিক বলল, এ্যাই শালা ব্লাডি বাগার, চোপ '

'আমি না হয় চুপ করছি, কিন্তু তুমি গেছ গুরু, হ্যা-হ্যা-হ্যা - ' খ্যাল খ্যাল করে হাসতে লাগল পেনো।

মানদা টিয়াকে বলল, 'শোন ছুঁড়ি ফটিকের যে ক'দিন ছুটি, তোর কাছেই থাকবে। দেখিস বাবার যেন অসুবিধা না হয়। ওকে এখন তোর ঘরে নিয়ে যা—'

কুসুম হঠাৎ চিলের মতো চেঁচিয়ে উঠল, 'ভাল ভাল যে খদ্দের

আসবে সব ও মাগীর ঘরে ঠেলে দেবে। সব সময় টিয়ার দিকে তোমার টান মাসি। আমরা বুঝি গাঙের জলে ভেসে এইছি।'

মানদা কুৎসিত ভাবে হাত-পা নেড়ে প্রায় তেড়েই গেল, 'আয়নায় মুখ দেখেছিস শুকনির বাচ্চা? ঘাটের মড়া ছাড়া তোর ঘরে ঢুকবে কে লা?'

এরপর দুজনের মধ্যে কিছুক্ষণ কদর্য গালাগালের আদান-প্রদান হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত দুম দুম পা ফেলে নিজের ঘরে চলে গেল কুসুম।

সে চলে যাবার পরও খানিকক্ষণ গজ গজ করল মানদা। তারপর টিয়াকে বলল, 'বসে রইলি কেন? ফটিককে নিয়ে যা '

টিয়া চোখ কুঁচকে ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে বলল, 'ওকে জিজ্ঞেস করলে আমায় মনে ধরেছে কিনা! কই আমাকে তো জিজ্ঞেস করলে না—'

'তোকে আবার কী জিজ্ঞেস করব?'

'ওকে আমার ভাল লেগেছে কিনা?'

মুখ বাঁকিয়ে মানদা একটা অশ্লীল ছড়া কাটল। তারপর বলল, 'নে আর ন্যাকারা করতে হবে না?'

অন্য মেয়েগুলো ফিসফিসিয়ে বলতে লাগল, 'মাগীর দেমাক দেখলে গা জ্বলে যায়।'

টিয়া হাতের ওপরে ভর দিয়ে উঠতে উঠতে ফটিককে বলল, 'এসো—'

ওদিকে পেনো ঝট করে ফটিকের মালপত্র কাঁধে তুলে ফেলেছে। সে বলল, 'চল ফটকেদা, বাসর ঘরের দরজা পর্যন্ত তোমায় এগিয়ে দিয়ে আসি—'

উঠতে উঠতে একটা লাথি ছুঁড়েছিল ফটিক। কিন্তু তার আগেই এক লাফে অনেকটা দূরে সরে গেছে পেনো।

মাঝখানে লম্বাটে উঠোন। তার ওপারে পুবদিকের একটা ঘরে টিয়া থাকে। আগে আগে টিয়া, তার পেছনে ফটিক আর পেনো চলেছে। আর বারান্দায় মানদাকে ঘিরে যে মেয়েগুলো বসে আছে তাদের মুখ হিংসেয় পুড়ে যেতে লাগল।

যেতে যেতে পেনো নীচু গলায় বলতে লাগল, 'জব্বর একখানা জিনিস পেলে ফটকেদা। ঘরের বউ বললে ঘরের বউ, বাজারের মেয়েমানুষ বললে বাজারের মেয়েমানুষ—একের ভেতর দুটোই পেয়ে যাবে।'

ফটিক কিছু বলল না।

ঘরের কাছে এসে টিয়া বলল, 'বাইরে একটু দাঁড়াও, আমি আলোটা জ্বেলে নি।' শেকল খুলে সে ভেতরে ঢুকে পড়ল।

বাইরে এখনও অল্প অল্প আলো থাকলেও ঘরের ভেতরটা অন্ধকার হয়ে গেছে। রাজানগরে কবেই ইলেকট্রিক আলো এসেছে কিন্তু এই মেয়েপাড়া পর্যন্ত পৌঁছায় নি। আসলে বিজলিবাতি জ্বালাবার মতো পয়সা তাদের নেই।

একথা হেরিকেন জ্বালিয়ে টিয়া ডাকল, 'জুতো-টুতোগুলো খুলে ভেতরে এসো।

পেনো চটি খুলে ঘরে ঢুকল, মালপত্তর কাঁধ থেকে নামিয়ে গোছগাছ করে রাখতে লাগল।

ফটিক কিন্তু দারুণ ক্ষেপে গিয়েছিল। নগদ পয়সা খরচা করে ফুর্তি করতে মেয়েমানুষের বাড়ী এসেছে, তার হুকুমমতো চলতে হবে নাকি। তীব্র বিদ্রূপের গলায় সে বলল, 'তোমার ঘরখানা রাধা-কেষ্টর মন্দির নাকি যে জুতো খুলে ঢুকতে হবে!'

টিয়া বলল, 'জুতো না খুললে আমার ঘরে ঢুকতে দেব না।'

'মাইরি আর কি!'

এই সময় পেনো হৈ-চৈ বাধিয়ে দিল, 'ওই ছাখো, ঘরে ঢুকতে

না ঢুকতেই ঝামেলা বাধিয়ে দিলে! এ্যাই ফটকেদা জুতোটা খুলেই ঢোকো না মাইরি! কত রাজ্যির নোংরা রয়েছে পায়ের তলায়। টিয়া আবার একটু পরিষ্কার-টরিষ্কার থাকতে ভালবাসে।'

'ব্লাডি ব্যাস্টার্ড—' বিরক্ত মুখে গজ গজ করতে করতে জুতো খুলে ফেলল ফটিক। তারপর ভেতরে ঢুকল।

পেনো বলল, 'বাসর ঘরে ঢুকে পড়েছে। আমি মাকড়া আর থাকি কেন? আমি ফুট হয়ে যাচ্ছি।' বলেই বেরিয়ে গেল। তারপর দরজায় বাইরে থেকে গলা বাড়িয়ে বলল, 'তোমার যা মেজাজ মাইরি, আবার টিয়াব সঙ্গে খেয়োখেয়ি লাগিয়ে দিও না। হাজার হোক পয়লা দিন।'

'এ্যাই শালা, এ্যাই—' ফটিক দৌড়ে বেরিয়ে আসছিল। তার আগেই পেনো দ্রুত দরজাটা টেনে লাফ দিয়ে উঠানে পড়ল। সেখান থেকেই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'আর ঝামেলা কোরো না, এখন লড়ে যাও গুরু।'

ফটিক আর বেরুল না। দরজাটা টেনে হাট করে খুলে এবার ঘরের ভেতরে তাকাল।

ঘরখানা সত্যিই খুব পরিচ্ছন্ন এবং সাজানো-গোছানোও। একধারে তক্তাপোশে ধবধবে বিছানা পাতা, উল্টোদিকে ছোট আলনায় পরিষ্কার ক'টি শাড়ি-সায়া-টায়া চমৎকার করে রাখা। আরেক ধারে সস্তা কাঠের আলমারি; তার গায়ে বড় একখানা জলচৌকির ওপর আয়না-চিরুনি, স্নো-পাউডার-আলতার কৌটো। তক্তাপোশের ওধারে কাঠের ছোট্ট সিংহাসনে কালীর পট। সেজন্য আলাদা বিছানা। তা ছাড়া আছে পুজোর বাসন, পেতলের প্রদীপ, ধূপদান, ফুলটুল। দেয়ালেও নানারকম ঠাকুর-দেবতার ছবি। একটা লম্বা কাঠের তাকে অনেকগুলো বই যত্ন করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

দেখতে দেখতে খুব অবাক হয়ে যাচ্ছিল ফটিক। মেয়েপাড়ায় আজই তো প্রথম এল না। পনের ষোল বছর ধরে এখানে তার নিয়মিত যাওয়া-আসা। কিন্তু কোনদিনই কারো ঘরে এত বই-পত্তর, এত ঠাকুর-দেবতা দেখেছে বলে মনে করতে পারল না ফটিক। এ সব পাড়ার মেয়েদের ঘরের দেয়ালে দেয়ালে যা থাকে তা হল আধ-ন্যাটো মেয়েমানুষদের ছবি। যারা চালাক-চতুর, খদ্দেরদের উত্তেজনা উস্কে দিতে ঘরভর্তি কামকলা আর কোকশাস্ত্রের নানা ছবি সাজিয়ে রাখে।

শুধু এই রাজানগরেই নাকি, জাহাজে ভাসতে ভাসতে যে বন্দরেই ফটিক গেছে, এডেন-মোম্বাসা-ওসাকা-সিঙ্গাপুর-লিভারপুল-রটারডাম —সেখানেই মেয়েপাড়ায় প্রথমে হানা দিয়েছে। কিন্তু কোথাও এমন পূজারিণী মার্কা বেশ্যা আগে দ্যাখে নি।

টিয়া হেরিকেনটা জ্বালিয়ে তার পাশেই বসে ছিল। বলল, 'দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বসো।'

এদিক সেদিক তাকিয়ে সোজা বিছানায় গিয়ে বসল ফটিক। বলল, 'মেলাই ঠাকুর-দেবতা জড়ো করে ফেলেছ দেখছি।'

টিয়া বলল, 'তা করেছি।'

ফটিক জিজ্ঞেস করল, 'তোমার বুঝি খুব ভক্তি ?'

টিয়া উত্তর দিল না।

ফটিক তাকের বই টইগুলো দেখিয়ে আবার বলল, 'ও গুলো কী বই ?'

'এই রামায়ণ-মহাভারত, নাটক নভেল-টভেল।'

'তুমি যে মাইরি খুব বিদ্বেন গো—'

টিয়া চুপ করে থাকল।

ফটিক বলতে লাগল, 'আমার চোদ্দ-পুরুষ একসঙ্গে অত বই দ্যাখেনি।'

টিয়া আবছাভাবে কী বলল বোঝা গেল না।

ফটিক আবার বলল, 'তোমার মতো বিদ্বেন মেয়েমানুষ এ পাড়ায় আগে আর কখনও দেখিনি।'

'তাই নাকি।'

'বিশ্বাস কর। মা কালীর দিব্যি—'

'ঠিক আছে। মা কালীকে আর টানাটানি করতে হবে না।'

একটু চুপ করে ফটিক বলল, 'যাক গে, অন্ধকার হয়ে এল। চানটা এবার সেরে ফেলি—'

'এই কার্তিক মাসে সন্ধ্যেবেলায় চান করবে?'

'কী হয় করলে?'

'সময়টা ভাল না; ঠাণ্ডা-ফাণ্ডা লাগিয়ে জ্বর না বাধিয়ে বোসো।'

এক পলক তাকিয়ে আচমকা জোরে জোরে গলা ছেড়ে হেসে উঠল ফটিক।

টিয়া অবাক, 'কী হল?'

'তুমি দেখছি বিয়ে-করা ওয়াইফদেরও নাকে র‍্যাঁদা ঘষে দিলে। বলে কিনা ঠাণ্ডা লাগবে! ভয় নেই, সারা বছর রাত্তিরে চান করার অভ্যেস আছে আমার।'

টিয়ার মুখ দেখে চট করে তার মনের কথা বুঝবার উপায় নেই। সে বলল, 'তেল, গামছা-টামছা দেব?'

'কিচ্ছু দরকার নেই। আমার সঙ্গেই সব আছে।' তক্তাপোশ থেকে উঠে গিয়ে চাবি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিজের ঢাউস স্টীলের বাক্সটা খুলে ফেলল ফটিক। তার ভেতর থেকে পাজামা, সাবান, আয়না, চিরুনি, বিলিতী তোয়ালে, হেয়ার-ক্রীম বার করল। তারপর শুধু তোয়ালে আর পাজামাটা কাঁধে ফেলে বেরিয়ে গেল।

এই মেয়েপাড়ার ভেতরে একটা কুয়ো আছে। বাইরে রাস্তার ধারে রাজানগর মিউনিসিপ্যালিটির একটা টিউবওয়েলও আছে।

টিউবওয়েলের দিকে আর গেল না ফটিক। সোজা কুয়োতলায় গিয়ে সাবান মেখে ভাল করে চান করল। তারপর শুকনো পাটভাঙা পাজামা পরে টিয়ার ঘরে ফিরে এল।

ভেজা প্যান্ট-জামা সঙ্গে করে এনেছিল ফটিক। সেগুলো বাইরের দড়িতে টাঙিয়ে দিয়ে এসে টিয়া দেখল, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সাদা ধবধবে কৌটো থেকে ক্রীম বার করে মাথায় মাখছে ফটিক। ক্রীম মাথা হতে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে ফটিক বলল, 'এবার তোমার সঙ্গে কথাবার্তাটা পাকা করে নেব।'

টিয়া তক্তাপোশের পায়ার গায়ে হেলান দিয়ে বসতে বসতে জিজ্ঞেস করল, 'কিসের কথাবার্তা?'

ফটিক বলল, 'একমাস আমার ছুটি। ছুটির দিন ক'টা তোমার কাছেই থাকছি। কি রকম কী দিতে হবে বল—'

'কি রকম বলতে?'

'তুমি মাইরি একেবারে নেকী।' ঘাড় ফিরিয়ে ফটিক বলল।

'টিয়ার ভুরু কুঁচকে গেল, 'ন্যাকামোর কী করলাম?'

চুল আঁচড়ানো হয়ে গিয়েছিল। আয়না চিরুনি নামিয়ে টিয়ার কাছে এসে কোমরে হাত রেখে দাঁড়াল ফটিক। বলল, 'ক্যাশ না ফেললে বিয়ে-করা হাজব্যাণ্ডকেই ছুঁড়িরা পাশে শুতে দেয় না; আর তুমি হলে গিয়ে আমার টেম্পোরারি বউ। ভ্যানত্যাড়া না করে বল দিকি, একমাসের জন্যে কত টাকা নেবে? এক্ষুনি ক্যাশ ডাউন করব।'

টিয়া সোজাসুজি তার চোখের দিকে তাকাল, 'এক মাসই যে তোমাকে আমার কাছে থাকতে দেব, সেটা ধরে নিচ্ছ কেন?'

মেজাজ চড়ে গেল ফটিকের, 'ক্যাশ দেব; থাকতে দেবে না কেন? ব্লাডি সোয়াইন, কুত্তীকা বাচ্চা—'

টিয়া হঠাৎ রুখে দাঁড়াল। তার চোখের তারা ঝলসে উঠল যেন, 'সন্ধ্যেবেলা শুধু শুধু খিস্তি দিচ্ছ কেন? খিস্তি খাস্তা করলে আমার ঘরে থাকতে পারবে না বলে দিচ্ছি, এক্ষুনি বার করে দেব।'

ফটিক ভীষণভাবে থতিয়ে গেল। আজ প্রথম না, সতের-আঠার বছর ধরে দুনিয়ার মেয়েপাড়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে সে। কিন্তু টিয়ার মতো আগে আর কাউকে কোথাও দেখেছে বলে মনে করতে পারল না। হাতে ক্যাশ গুঁজে দিয়ে শুধু খিস্তি-খাস্তা কেন, চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করে যা ইচ্ছে করে যাও, ছুঁড়িগুলো দাঁত বার করে হেসে হেসে গায়ে ঢলে পড়বে—এতদিন ফটিকের এ-ই ছিল অভিজ্ঞতা। কিন্তু তাদের সবার থেকে রাজানগরের টিয়া মেয়েটা একেবারে আলাদা।

হঠাৎ টিয়ার কাছ থেকে দরজার দিকে চলে এল ফটিক। বাইরে গলা বাড়িয়ে ডাকতে লাগল, 'এ্যাই পেনো—এই ব্লাডি হারামী—'

এর মধ্যে সন্ধ্যে পেরিয়ে গেছে। মেয়েপাড়ার ঘরে ঘরে হেরিকেন কিংবা কেরোসিনের ডিবে জ্বলে উঠেছে। এখন কার্তিকের শেষাশেষি এই সময়টায় রাত্রের দিকে, অন্ধকারের সঙ্গে হিম মিশে আবছা মতো হয়ে যায়। ঝাপসা অন্ধকার উঠোনের ওধারে থেকে পেনো এসে হাজির হল। শেয়ালের মতো সন্দিগ্ধ চোখে ফটিককে দেখতে দেখতে বলল, 'বাসর ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে গেলুম, তার ভেতর আবার পেনো মাকড়াকে ডাকাডাকি কেন? আমি শালা তো কাবাবমে হাড্ডি হয়ে যাব।' কথার মধ্যে আচমকা দু-চারটে হিন্দি শব্দ ঢুকিয়ে নেওয়া পেনোর অভ্যাস। হারামীটা রগরগে হিন্দি ছবি দেখে দেখে একেবারে ঘুণ হয়ে গেছে।

পেনো টিয়ার ঘরের ধার ঘেঁষে উঠোনেই দাঁড়িয়ে ছিল। হাতের ইশারা করে সে বলল, 'আয়, ভেতরে আয়।

'ভেতরে যাব কেন?'

'আগে আয়, তারপর বলছি—'

পেনো ভয়ে ভয়ে শুধলো, 'আবার লাথি-ফাথি হাঁকড়াবে না তো ?'

ফটিক বলল, 'না রে শালা, না –'

তবু ভয়টা কাটল না। খুব সতর্কভাবে, ফটিক পা বা হাত চালাবার তাল করলেই যাতে চট করে কেটে পড়া যায়, পেনো টিয়ার ঘরের বারান্দায় উঠে এল। আব ফটিক করল কি, লাথি বা থাপ্পড়, কোনটাই কষাল না। আলতো করে তার লিকলিকে সরু ঘাড়টা ধরে ভেতরে নিয়ে গেল। টিয়াকে দেখিয়ে বলল, 'এ কার ঘরে আমায় ঢুকিয়েছিস রে পেনো ?'

ফটিক কী বলতে চায় বুঝতে না পেরে একবার ফটিক, আরেকবার টিয়ার দিকে তাকাচ্ছিল পেনো বলল, 'কী হয়েছে ?'

'বলেছিলাম ব্লাডি-সোয়াইন-কুত্তীকা বাচ্চা তাতেই ওর গায়ে ফোস্কা পড়ে গেছে। চামড়া মাইরি একদম গোলাপ ফুলের পাপাড়ি - '

পেনো দাঁত বার করে এবং টেনে টেনে তার স্বভাবের সেই হাসিটা হাসল, হে—হে—'

ফটিক আবার বলল, 'আমায় বলে কিনা, ঘর থেকে বার করে দেবে –'

পেনো জড়ানো গলায় আবার হেসে উঠল, 'হে—হে—' তারপর চোখেব তারা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আগের মতোই তুজনকে দেখতে দেখতে বলতে লাগল, 'তোমাদের দেখছি প্রেমের ঝগড়া। আমার আর এর ভেতব থাকা কেন ? নিজেরাই ফয়সালা করে নাও গুরু। আমার এখন বাজারে ছুটতে হবে—' বলেই আর দাঁড়াল না, ইঁতুরের মতো স্মুড়ুৎ করে দরজার ভেতর দিয়ে অন্ধকারে উঠোনে গিয়ে নামল।

টিয়া তু চোখে আগুন নিয়ে ফটিককে দেখছিল। এবার বলল 'দেখ, এসব রঙ-তামাশা আমার ভাল লাগে না।'

ফটিক বুঝতে পারছিল, পেনোকে ডেকে আনার জন্য খুবই চটে

গেছে টিয়া। সে বলল, 'আর কী কী তোমার ভাল লাগে না?'

'অনেক কিছুই—'

ফটিক এবার করল কি, টিয়ার কাছে গিয়ে তার গলা দু হাতে জড়িয়ে বলল, 'তুই মাইরি ভুল করে এ পাড়ায় চলে এসেছিস। শালী আমার সতী! ব্লাডি বাস্টার্ড!'

ব্লাডি বাস্টার্ডটা সব সময় গালাগালের জন্য বলে না ফটিক। ওটা তার কথার মাত্রা।

এক ঝটকায় ফটিকের হাত সরিয়ে দিয়ে টিয়া বলল, 'আবার, আবার খেউড় শুরু করলে! তোমাকে না তখন বারণ করে দিলাম।'

'ইচ্ছে করে বলি নি রে—' খানিকটা আপসের সুরে ফটিক বলল, 'গলার ভেতর থেকে কেমন করে যেন হড়কে বেরিয়ে এল। যাক গে, আর ঝঞ্ঝাট না করে দর-দামটা ঠিক করে ফ্যাল, এক মাসের জন্যে তোকে কিনে ফেলি।'

টিয়া কিছু বলল না, স্থির চোখে তাকিয়ে রইল শুধু।

ফটিক নিজের অজান্তেই তুই টুই শুরু করে দিয়েছিল। তা-ই চালিয়ে যেতে লাগল, 'চোখ যে তোর গোল্লা পাকিয়ে গেল! বলে ফ্যাল কত নিবি?'

টিয়া এবার বলল, 'আগে তোমায় দু'একদিন দেখি, তারপর কেনাকিনির কথা উঠবে।'

'বুঝেছি।'

টিয়া কিছু বলল না, আগের মতই তাকিয়ে থাকল।

ফটিক বলতে লাগল, 'আমি কেমন স্যাম্পল না দেখে বুঝি নিজেকে বেচবি না! অল রাইট—দেখেই নে তা হলে।'

টিয়া এবারও চুপ।

ফটিক বলল, 'মুখে বল্টু এঁটে চোখে হেডলাইট জ্বেলে তাকিয়ে থাকলে কি ভাল লাগে! কাছে আয়—'

টিয়া এক মুহূর্ত কি ভাবল, তারপর পায়ে পায়ে ফটিকের সামনে এসে দাঁড়াল, 'কী বলছ?'

হাত ধরে টিয়াকে পাশে বসিয়ে ঝট করে তার গালে চার পাঁচটা চুমু খেয়ে নিল ফটিক। টিয়া এবার ঝটকা মারল না; চুমু খাওয়া হলে খুব শান্ত ভাবে শাড়ির আঁচল দিয়ে গাল দুটো মুছে নিল।

ফটিক বলল, 'তুই যেন মাইরি কেমন!'

'কেমন?'

'ঠিক বলতে পারব না।'

টিয়া হাসল, 'বেঠিকই বল না।'

ফটিক বলল, 'ভেবে পরে বলব।'

'আচ্ছা।'

একটা ব্যাপার আগাগোড়া লক্ষ করছে ফটিক, সেই তখন থেকে তার দিকে পলকহীন তাকিয়ে আছে টিয়া। ফটিক বলল, 'কী ব্যাপার রে, অমন করে তাকিয়ে আছিস?'

টিয়া বলল, 'তোমাকে দেখছি।'

'আমি কি দেখবার মতো মাল?'

'এখনও বুঝতে পারছি না। দেখি দিন কতক।'

'দেখেই যা।'

আবার কী বলতে যাচ্ছিল ফটিক, সেই সময় বাইরে পেনোর গলা শোনা গেল, 'গুরু—'

'কী বলছিস?'

'খুব জমে গেছ নাকি?'

'জমতে আর পারছি কই, বার বার ছানা কেটে যাচ্ছে রে—' বলে চোখের কোণ দিয়ে টিয়াকে একবার দেখে নিল ফটিক।

'না জমে থাকলে পরে জোমো। এখন টিয়াকে নিয়ে একবার বাইরে এসো দিকি।'

'কেন ?'

'মাংস-ফাংস নিয়ে এইছি। সবার ইচ্ছে মাংসটা টিয়াই রাঁধবে—'

টিয়া বেরিয়ে গেল ; দেখাদেখি ফটিককেও বেরুতে হল।

টিয়া বলল, 'মাংস কোথায় ?'

পেনো বলল, 'মাসির ঘরে রেখেছি'

'ঠিক আছে, আমিই রাঁধব।'

'রগরগে করে বানাস দিদি, বাংলা মালও এনেছি ; যা জমবে না !'

টিয়া বড় বড় পা ফেলে চলে গেল।

ফটিকরাও দাঁড়াল না। পাতলা অন্ধকারে পাশাপাশি যেতে যেতে পেনো চট করে একবার ফটিককে দেখে নিয়ে বলল, 'জিনিসখানা কেমন গুরু ?'

পেনো কার কথা বলছে বুঝতে অসুবিধে হল না ফটিকের। বললে, 'সবে তো দেখলাম। এক্ষুনি কি করে বলব—'

পেনো আগ্রহের সুরে বলল, 'যেটুকু দেখলে তাতে কি মনে হল ?'

'শালী খুব খেলবে মনে হচ্ছে।' ফটিক বলতে লাগল, 'মাঝে মাঝে স্পার্ক ছ্যায়, আবার কেমন যেন ফিউজ মেরে যায়। দেখি কদ্দুর খেলে !' একটু থেমে আবার বলল, 'এ রকম জিনিস বাপের জন্মে দেখি নি।'

পেনো খিলখিলিয়ে হেসে উঠল, 'জিনিসখানা তাহলে পছন্দ হয়েছে—'

ফটিক কিছু বলল না।

পেনো আবার বলল, 'গুরু তুমি মাইরি পটকে গেছ।'

ফটিক খেঁকিয়ে উঠল, 'এ্যাই-এ্যাই শালা ব্লাডি সোয়াইন ; ফটকে হোল ওয়ার্ল্ডের অনেক মেমসাহেব মাগী দেখেছে। একটা দেশী কেলে ছুঁড়ি দেখে অত সহজে সে পটকায় না।'

পেনো এবার এক কাণ্ডই করে বসল। চাপা রগড়ের গলায়

খ্যাকখেঁকিয়ে গেয়ে উঠল, 'ও কালে হায় তো ক্যা হুয়া দিলবালী হায়। ও তেরে তেরে '

ফটিক অকারণেই ক্ষেপে উঠতে গিয়ে হেসে ফেলল, 'বাস্টাড', হারামী কাঁহাকা!' বলেই অন্ধকারে লাথি হাঁকড়াল কিন্তু আগে থেকেই গন্ধ পেয়ে ঝট করে সরে গিয়েছিল পেনো।

একটু পরে দু'জনে মানদার ঘরের দাওয়ায় এসে উঠল।

মানদার দাওয়ায় এখন মেলা বসে গেছে। মানদা তো ছিলই, পাড়ার অন্য মেয়েরাও আছে। এমন কি কুসুমও এসেছে। খানিক আগের রাগ-টাগ আর তার নেই।

এধারে ওধারে তিন-চারটে হেরিকেন জ্বলছিল। মেয়েরা গোল হয়ে বসে কেউ আলুর খোসা ছাড়াচ্ছিল, কেউ পেঁয়াজ কাটছিল, কেউ বাটনা বাটছিল; চার-পাঁচজন মাংস বেছেবুছে সমান মাপে টুকরো টুকরো করে কাটছিল। টিয়াও ওদের সঙ্গে হাত লাগিয়েছে।

হাতের সঙ্গে সঙ্গে ওদের মুখও চলছিল। কথা আর কথা। সবাই দারুণ হাসিখুশি। কথায় কথায় হাসতে হাসতে এ ওর গায়ে ঢলে পড়ছিল।

আজকের এই রাতটা একেবারে আলাদা। অন্যদিন এতক্ষণে মুখে রঙ মেখে চটকদার উলঙ্গ বাহার শাড়ি পরে সদর দরজায় গিয়ে দাঁড়াতে হয়। পেটের জন্য দাঁতাল-মাতাল যে-ই আসুক তার হাত ধরে ঘরে নিয়ে আসতে হয়।

প্রতিদিনের সেই নোংরা কুৎসিত জীবন থেকে বেরিয়ে এসে আজকের এই রাতটা যেন ফুলের মতো ফুটে উঠেছে। দু-এক বছর পর পর ফটিক যেদিন এই মেয়েপাড়ায় আসে সেদিনটা সব রকম গ্লানি থেকে তাদের মুক্তি; পেটের ধান্দা থেকে ছুটি। এই দিনটা তাদের মোটামুটি একটা উৎসবেরই দিন।

ফটিককে দেখে সাড়া পড়ে গেল। মানদা তার ঘর থেকে সেই মোড়াখানা আবার বার করে এনে বলল, 'বসো বাবা, বসো—'

ফটিক বসলে তার পায়ের কাছে ঘন হয়ে বসল পেনো।

পেঁয়াজ কুচোতে কুচোতে ঘাড় ফিরিয়ে টগর বলল, 'এ্যাদ্দিন পর তুমি এলে ; বড্ড ভালো লাগছে গো ভালোদাদা।'

এই মেয়েটাকে বেশ ভালই লাগে ফটিকের। পয়সা ফেলে গায়ে গায়ে দাম তোলার মতো সম্পর্ক কোনদিনই তাব সঙ্গে হয় নি। প্রথম থেকেই মেয়েটা গায়ে পড়ে দাদা ডেকেছে। যদিও ফটিক পয়লা নম্বরের লুচ্চা, মাতাল, তবু তার পক্ষে যতটা সম্ভব টগরকে মর্যাদা দিয়ে এসেছে। অল্প হেসে সে বলল, পেনো যা মাংস-ফাংস এনেছে তাতে সবার হবে তো ?'

'হয়েও বেশি। কাল বাসিও খাওয়া যাবে। পেনো মুখপোড়া একেবারে বিয়ে বাড়ির বাজার করে এনেছে।'

ওধার থেকে একটি মেয়ে বলে উঠল, 'কার বিয়ে লা টগরী ?'

টগর একটু ভেবে নিয়ে আড়ে আড়ে টিয়াকে দেখতে দেখতে বলল, 'কার আবার, টিয়ার।'

আর একটি মেয়ে চাপা গলায় বলল, 'বিয়ে না লা, সাঙা—'

আর আচমকা লাফিয়ে উঠে পাক দিয়ে নাচতে নাচতে উলু দিতে লাগল পেনো।

মুখ বাঁকিয়ে ঠগর বলল, 'মরণ।'

হাসতে হাসতে মানদা বলল, 'মুখপোড়ার কাণ্ড ছাখো !'

ফটিক ঘাড় ধরে পেনোকে বসিয়ে দিতে দিতে বলল' 'খুব হয়েছে মাকড়া—'

পেনো মুখটা করুণ করুণ করে বলল, 'ফুর্তি হয়েছিল ; তার বারোটা বাজিয়ে দিলে ফটকেদা—'

ফটিক বলল, 'শালা তোমার ফুর্তি ! এমন কোতকা হাঁকড়াব

গঙ্গার ওপারে গিয়ে পড়বি।' বলতে বলতে হঠাৎ কি মনে পড়ে গেল, 'তা হ্যাঁ রে ব্লাডি সোয়াইন—'

'বল গুরু—'

'মাল মাংস-টাংস এল, আমাদের মেসোকে বলে এয়েছিস?'

'মেসো, ভগ্নিপতি, জ্যাঠা—সব্বাইকে খবর দিয়ে এসেছি। দ্যাখো না, একটু পর কি রকম সুট সুট করে হাজির হয়। একে তুমি এয়েছ তার ওপর মাল-মাংস আছে, শালারা এল বলে।'

মেসো হল সঞ্জীবনী আয়ুর্বেদ ভবনের শশী কবিরাজ—শশিভূষণ সেন ভিষগরত্ন। এই লোকটা বাড়িউলি মানদার ভালবাসার মানুষ। মাসির সঙ্গে তাকে জুড়ে মেয়েপাড়ার বাসিন্দারা এবং এখানে যাদের নিয়মিত যাতায়াত তারা শশি কবিরাজকে বলে মেসো।

ভগ্নিপতি হল ফোটোর দোকানের মন্মথ। মন্মথ টগরের ভালবাসার মানুষ। টগরের সঙ্গে ফটিকের ভাইবোন সম্পর্ক। সেই সুবাদে মন্মথ হল ভগ্নিপতি।

দেশী মদের দোকানের প্রোপ্রাইটর বৃন্দাবনকে সবাই বলে জ্যাঠা; খুব সম্ভব তার ভারিক্কী ধরনের চেহারা বলে। এই লোকটা মালতী বলে মেয়েটির ভালবাসার মানুষ। বৃন্দাবনকে জ্যাঠা বললেও মালতীকে কেউ অবশ্য জ্যাঠাইমা বলে না।

অনেক রাত্তিরে মেয়েপাড়ার বিকিকিনি বন্ধ হয়ে গেলে তিনজনে ইঁদুরের মতো নিঃশব্দে যে যার মেয়েমানুষের ঘরে ঢুকে পড়ে।

যাই হোক ফটিক আবার কি বলতে যাচ্ছিল, খোলা সদর দরজায় মাতালের গলা শোনা গেল। একটা মধ্যবয়সী লোক টলতে টলতে এগিয়ে আসছিল, 'কোথায় গেলে গো অপ্সরীরা, ইন্দ্রপুরী আজ অন্ধকার কেন?'

লোকটাকে চেনা গেল—রাজানগরেরই এক দোকানদার। মানদা

তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে বলল, 'আজ এখানে হবে না; অন্য জায়গায় যাও—'

লোকটা লাল চোখ মেলে জড়ানো গলায় বলল, রাজানগরের এই একটাই তো যাবার জায়গা। স্বগ্‌গ গো স্বগ্‌গ।'

মানদা তাকে অনেক বোঝালো কিন্তু লোকটা নড়ে না। খালি বলে 'এখান থেকে কোথাও যাচ্ছি না।' মানদা খুব একটা চটাচটি করতে পারছিল না; হাজার হোক রোজকারের খদ্দের। তবু কড়া গলায় বলল, 'আজ যাও, কাল এসো—'

'কী বলছ চাঁদবদনী! আজকের আনন্দটা মাটি করে দিতে চাও!'

'ভাগো তো—'

'তাড়িয়ে দিলে মরে যাব মাইরি—'

'কি বিপিত্তি (প্রবৃত্তি) তোমার! বারোমাস নিত্যিদিনই তো আসছ; একটা দিন খ্যান্ত থাকতে পার না?'

'পারি না রে সুধামুখী, পারি না—'

'আজ পারতে হবে।'

মাথাটা ঘাড়ের উপর ঠিক স্থির থাকছিল না। অনবরত দুলছিল। একটা ঝাঁকুনি দিয়ে সেটাকে খাড়া করবার চেষ্টা করল লোকটা। তার পর বলল, 'ব্যাপার কি; গভরমেণ্ট হপ্তার দেড়দিন তোমাদের দোকানদারি বন্ধ করে দিয়েছে?'

এবার নিজের স্বরূপে দেখা দিল মানদা। চোখ পাকিয়ে কোমরে আঁচল গুঁজে নাকের নথ নেড়ে বলল, 'এবার যাবি গু-খেকোর ব্যাটা, না ঘাড় ধরে বার করে দেব?' বলেই পেছন ফিরে ডাকল, 'পেনো—'

লোকটা ঘাড় ধরবার কথায় খানিকটা ধাতস্থ হল। বলল, 'কি, এতবড় আস্পদ্ধা, বাজারের মেয়েমানুষ; আর আসব না এই ভাগাড়ে।'

'না আসবি না আসবি। মেয়েমানুষের গায়ে মাংস থাকলে

তোর মতো কতো শ্যাল-কুকুর এসে হাজির হবে।'

এর মধ্যে পেনো এসে পড়েছিল। মাতালটাকে সে তাড়িয়ে তাড়িয়ে রাস্তায় তুলে দিয়ে একটু পরে ফিরে এল।

মানদা তাকে বলল, তোকে না বলেছিলাম সন্ধ্যেবেলা সদরের কাছে বসে থাকবি ; মড়াগুলোকে ঢুকতে দিবি না ?'

পোনো ঘাড় চুলকোতো চুলকোতে বলল, 'তোমরা এখানে বসে গল্প করবে, রগড় করবে, আমি শালা স্ট্যাচু হয়ে সদর দোর আগলাব !'

কথাটা ভাববার মতো। একটু চুপ করে থেকে মানদা বলল, 'তা হলে এক কাজ কর ; সদর দোরে হুড়কো লাগিয়ে দে।'

দরজা বন্ধ করে পেনো তার জায়গায় ফিরে এল। তারপর চলল নানা রকম গল্প, রগড, আমোদ আর আতসবাজির ফুলকির মতো হাসি। ফটিকই গল্প করছিল বেশি, জাহাজের গল্প। সমুদ্রযাত্রার মজার মজার কাহিনী।

এর মধ্যে মাংস ধুয়ে-টুয়ে টিয়া উনুনে চাপিয়ে দিয়েছে। অন্য মেয়েরা হাতে হাতে তাকে সাহায্য করছিল।

এ-সবের ফাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে মাতালেরা এসে সদরে ধাক্কা দিচ্ছিল ; কেউ কেউ আবার পাঁচিল টপকে ঢুকবার চেষ্টা করছিল। পেনো বার বার উঠে গিয়ে তাদের তাড়িয়ে দিয়ে আসছিল। যারা পাঁচিল টপকাতে চাইছিল লাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে তাদের ওধারে ফেলে দিচ্ছিল।

রান্না-বান্না চুকতে চুকতে মাতালদের ঝামেলা কমে গেল। তারও কিছুক্ষণ পর সদরে ধাক্কা পড়ল, 'দোর খোল রে।'

পেনো বলল, 'কে তুমি ?'

'আমরা রে আমরা।'

গলার স্বরেই বোঝা গেল শশী কবরেজরা এসেছে। তাড়াতাড়ি

উঠে গিয়ে পেনো দরজা খুলে দিল। শশী, মন্মথ বৃন্দাবন ভেতরে ঢুকতেই আবার সদর বন্ধ করল।

শশী বলল, 'দোরে খিল দিয়ে রেখেছিস কেন?'

কারণটা এক কথায় জানিয়ে দিয়ে ওদের নিয়ে মানদার দাওয়ায় এসে উঠল পেনো।

শশীর বয়েস পঞ্চান্নর কাছাকাছি। পরনে গলাবন্ধ ধুসো কোট আর ধুতি, কোঁচা লটপট করছে, মুখময় তিনচার দিনের কাঁচা পাকা দাড়ি, ঢিবির মতো নাকে দু'ধারে গোল গোল চোখ। মাথার জায়গায় জায়গায় চর পড়ার মতো টাক। মাথার ক্ষতিপূরণ হয়েছে অন্যভাবে। নাক-কানের ভেতর থেকে গোছায় গোছায় লোম বেরিয়ে ঝুলে আছে। রাজানগর স্টেশনের কাছে তার বাড়ি আছে, ছেলেমেয়ে বউ নিয়ে জমজমাট সংসার আছে। সপ্তাহে তিন দিন বাড়িতে থাকে শশী, বাকি চারদিন মানদার জন্যে বরাদ্দ। শশী মাঝে মাঝে রগড়ের গলায় বলে, 'আমার চারদিন শ্রীরাধিকের, তিনদিন চন্দ্রাবলীর।' শালা যেন সার্কাসের দড়ির খেলা জানে। একদিকে বউ, আরেক দিকে মেয়েমানুষ, তিরিশ বছর ধরে দু'দিক সামলে যাচ্ছে।

বৃন্দাবনের ছেলেমেয়ে, ঘর-সংসার কেউ নেই, কিছু নেই। সে দু-কান কাটা; তারপর দোকান বন্ধ করে চলে আসে মালতীর কাছে। মালতীর ঘরেই তার বাক্স-বিছানা, নিজের বলতে যা কিছু সবই থাকে। বৃন্দাবনের বয়েস পঞ্চাশের কাছাকাছি, কালো থলথলে শরীর, আমড়া-আঁটির মতো বড় বড় চোখ, শুয়োরের রোঁয়ার মতো খাড়া খাড়া চুল। পরনে ধুতি, তার ওপর হাফ শার্ট।

ফোটোর দোকানের মন্মথর বয়েস চল্লিশের কাছাকাছি। পাতলা ছিপছিপে চেহারা; কাটা কাটা মুখ; ধারালো চিবুক; ফর্সা রঙ। মন্মথ বেশ সৌখিন মানুষ। টেরেলিনের প্যান্ট, টেরিনের শার্ট হাঁকায় সে; চোখে দামী গগলস লাগায়; পায়ে নক্সাদার চপ্পল।

নদীর পাড়ে শ্মশানে যত মড়া আসে তাদের ছবি তোলাই তার কাজ।

মন্মথরও কবরেজেদের মতো বউ ছেলেমেয়ে আছে। নদীর ওপারে শ্বশুর বাড়িতে ওরা থাকে। তার ভালবাসার মানুষ হল টগর।

প্রায়ই নদীর ওপার থেকে মন্মথর বউ এসে মন্মথকে নিয়ে যায়। কোনদিন না আসতে পারলে টগর তার ঘরে ধরে নিয়ে আসে। মন্মথ বলে, 'আমি বাওয়া বেওয়ারিশ মাল; যে এসে ছোঁ মারতে পারবে আমি তার। ছেলে বয়েসে ঠাকমা গল্প বলত, পাখি এখন তুমি কার? পাখি বলে, যার হাতে তার। আমার হল তা-ই। যখন টগর ধরে তখন টগরের, যখন বউ ধরতে পারে তখন বউর' মন্মথকে নিয়ে তার বউ আর টগরের ভেতর দড়ি-টানাটানি চলে আসছে।

ওদের দেখে ঘর থেকে আরো তিনটে মোড়া বার করে আনল মানদা। বসতে বসতে মন্মথ বলল, 'বেশ জমিয়ে বসেছিস যে রে ফটকে—'

ফটিক হাসল, 'তা বসেছি।'

এরপর কে কেমন আছে, কাজ কারবার কেমন চলছে, রাজানগরের নতুন কোন খবর আছে কিনা, ইত্যাদি ইত্যাদি নানা কথা জিজ্ঞেস করল ফটিক। ওরাও জাহাজে জাহাজে দু'বছর ধরে ফটিক কোথায় কোথায় ঘুরেছে তার খবর নিল।

এইসব এলোমেলো কথার ফাঁকে হঠাৎ পেনো বলে উঠল, 'গল্প করে করেই তোমরা রাত কাবার করে দেবে নাকি? আমার মাইরি বড্ড খিদে পেয়ে গেছে, পেটের ভেতর শালা যেন ছুঁচ ফুটছে।'

সবাই প্রায় একই সঙ্গে বলে উঠল, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঢের রাত হয়ে গেছে। এবার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কর।'

মানদা বলল, 'ব্যবস্থা আর কি; রান্না তো হয়েই গেছে। এ্যাই মেয়েরা খাবার জায়গা করে ফ্যাল—'

পেনো বাজার থেকে কলাপাতা আর মাটির গেলাস নিয়ে এসে-

ছিল। মেয়েরা ঢালা বারন্দায় সারি সারি পাতা পেতে পাশে পাশে গেলাস দিয়ে দিল। টিয়া, টগর আর মানদা বাদে অন্যরা খেতে বসে গেল। সবাই একসঙ্গে বসলে ভাত-টাত দেবে কে ?

খেতে খেতে মন্মথ বলল, 'মাংসটা মাইরি যা রগরগে হয়েছে !'

পেনো বলল, 'হবে না ! কে রেঁধেছে দেখতে হবে তো—'

শশী কবরেজ জিজ্ঞেস করল, 'কে রেঁধেছে রে ?'

'টিয়া—'

ওধার থেকে টগর বলল, 'রাঁধবে না কেন, ওর প্রাণে এখন কত ফুর্তি।'

খেতে খেতে মুখ বাকিয়ে কুসুম বলল, 'ফুর্তি একেবারে গেঁজে গেঁজে তাড়ি হয়ে উঠেছে।'

বৃন্দাবন শুধলো, 'খাওয়াচ্ছে তো ফোটকে ; টিয়ার অত ফুর্তি কেন ?'

পেনো বলল, 'ফটকেদাকে মাসি এবার টিয়ার হাতে তুলে দিয়েছে যে গো জ্যাঠা ; ছুটির মাসটা গুরু আমার টিয়ার কাছে থাকবে।'

বৃন্দাবন গম্ভীর চালে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, 'বেশ বেশ ; টিয়া আমাদের বড় ভালো মেয়ে।,

খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে আরেক দফা হাসি-ঠাট্টা, অশ্লীল রসিকতা এবং নানা ধরনের কথা হতে লাগল।

ফঠিকদের খাওয়া হলে টিয়ারা তাড়াতাড়ি খেয়ে নিল। গলা পর্যন্ত খেয়েও প্রচুর মাংস বেঁচে গেল। পরের দিনের জন্যে সেগুলো ভাল করে ঢেকে রাখল মানদা।

ফটিক বলল, 'এ্যাদ্দিন পর এলাম। সব বার গান বাজনা হয় ; এবার একটু হবে না ?'

পেনো উৎসাহে চেঁচিয়ে উঠল, 'জরুর হোগা, আভ্ভি হোগা। টগর, তোর হারমোনিয়ামটা বার কর।'

টগর তার ঘর থেকে একটা রিডভাঙা বেলো-ফেঁসে-যাওয়া পুরানো হারমোনিয়াম বার করে আনল।

পেনো টিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোরই তো আজ দিন, কড়া দেখে একখানা গেয়ে ফ্যাল। দিল তোর করে দে মাইরি—'

টিয়া বলল, 'আমি গাইতে পারব না, টগর গাক।'

টগর বলল, 'উঁহু, কুসুম গাক—'

কুসুম অশ্লীল মুখ ভঙ্গি করে বলল, 'গানের মাথায় খ্যাংরা—'

বিরক্ত মুখে মানদা বলল, 'ছুঁড়িদের কত যে ঠ্যাকার! কারুকে গাইতে হবে না, আমি গাইছি।' বলেই হারমোনিয়ামটা টেনে বসে গেল:

'ভালবাসিবে বলে ভালবাসি নে
আমার এই রীতি তোমা বই
জানি নে।
বিধুমুখে মধুর হাসি
দেখিলে সুখেতে ভাসি
তাই তোমারে দেখতে আসি
দেখা দিতে আসি নে।'

মানদার গলা এককালে মিষ্টিই ছিল। এখন বয়সের ভার পড়েছে সেখানে, সূক্ষ্ম কাজগুলো আর ফোটে না, সুর চড়ায় তুলতে গেলে গলা চিরে যায়। তবু ভালই গাইল সে।

ফটিক হেসে হেসে বলল, 'গানে কার মনের কথা বললে গো মাসি, আমাদের মেসোর নাকি?'

চোখের কোণে কোবরেজকে বিদ্ধ করতে করতে মুখ কোঁচকাল মানদা, 'মরণ! মনের কথা বলবার আর লোক পেলাম না!'

শশী কবরেজ গলার ভেতর ঘড়ঘড়ে একটা শব্দ করল।

পেনো ওধার থেকে বলে উঠল, 'মাসি তুমি গেয়েছ ভাল কিন্তু

ওসব বস্তাপচা মাল। আজকাল আর চলে না।'

মানদা রাগ করল না। হেসে বলল, তা কি করব বল্; আমরা তো আজকালকার লোক না। পুরনো গান ছাড়া কিছুই জানি না বাপু। সে আমলে আমরা কুসুমকুমারীর গান শুনতাম, আঙ্গুর-বালা, নীহারকণার গান শুনতাম,আহা কানে যেন লেগে আছে।'

পেনো বলল, 'ওসব কুসুমকুমারী-টুমারী ছাড়ো, হিন্দী-ফিন্দী না হলে এখন আর জমে না। এই টগর, ধর না মাইরি একটা - '

টগর বলল, 'তখনই তো বললাম, গাইব না।'

'শালী তোদের পায়ে কত তেল রগড়াব বল্ তো? এত করে বলছি—'

টগর আর কিছু না বলে হারমোনিয়মটা টেনে গান ধরে দিল:

'দম মারে দম
বীত যায়ে হাম
বোলো সুবহ্ সাম
হরে কৃষ্ণ হরে রাম—
দম মারো দম—'

তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো পেনো। ফটিককে বলল, 'গানা হোগা, নাচা নেহী হোগা?'

ফটিক বলল, জরুর।'

'কার মতো নাচব, হেলেন, জয়শ্রী টী না বিন্দু?'

ফটিক হিন্দী ছবি-টবি বিশেষ ছাখে না; দেখবার সুযোগই নেই। মাসের পর মাস সে দেশের বাইরে পড়ে থাকে। যে পোর্টেই তাদের জাহাজ ভেড়ে সেখানে হিন্দী-টিন্দীর কারবার নেই, শুধু রগরগে হলিউডের ছবি। ন্যাংটো মেমসাহেব কিংবা বণ্ড মার্কা ঝাঁঝালো দম-আটকানো কাণ্ডকারখানা। তার মানে শুধু ইংরেজির ব্যাপার। সে বলল, 'ওরা সব কারা রে?'

'উরি ব্বাস !' চোখ-মুখ গোল করে একটা মজাদার ভঙ্গি করল পেনো, 'ওরা সব গরম মসলা। হেলেন এখনও চালিয়ে যাচ্ছে। ঠিক হ্যায়, বিন্দুই চালাই—' বলেই কোমরে হাত দিয়ে শরীর বাঁকিয়ে-চুরিয়ে দারুণ দারুণ মজাদার ভক্তি করে নাচতে লাগল। তার নাচ দেখে হেসে হেসে মরে যেতে লাগল মেয়েরা, মানদা, বলল, 'মুখপোড়ার মরণ !'

বৃন্দাবন বলল, 'ঘুরে-ফিরে ব্যাটা, ঘুরে-ফিরে—'

হাসতে হাসতে ফটিকের দম আটকে আসছিল। তার মধ্যেই সে বলতে লাগল, 'ব্লাডি সোয়াইন কুত্তীকা বাচ্চার কারবারটা ছ্যাখো ! শালাকে এমন রগড়ান দেব, হাড্ডি ঢিলে হয়ে যাবে।' পা বাড়িয়ে বাড়িয়ে আলতো করে সে লাথি চালিয়ে যেতে লাগল।

টগর একটার পর একটা হিন্দী গান চালিয়ে যাচ্ছে। 'দম মার দম'-এর পর 'দিল মেরে দিওয়ানা, পেয়ার মেরে মস্তানা' ইত্যাদি ইত্যাদি।

গাইতে গাইতে ক্লান্ত হয়ে এক সময় থেমে গেল টগর কিন্তু পেনো আর থামে না। আরো আধ ঘণ্টা নেচে ভুম করে এক সময় বসে পড়ল। ঘেমে নেয়ে উঠেছে সে। আধ হাত জিভ বার করে বসে বসে পেনো হাঁপাতে লাগল।

বাদবাকি সবাই হেসে যাচ্ছিল। হঠাৎ কি মনে পড়তে পেনো মানদার দিকে ফিরে বলল, 'হেসে হেসে তো ময়দা মাখা হয়ে যাচ্ছ মাসি, আসল জিনিসখানা এবার বার কর।'

মানদা কোন রকমে হাসিটা একটু সামলে বলল, 'কী জিনিস রে পোড়ারমুখো ?'

'ভুলে গেলে !' পেনো জিভের ডগা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে উচ্চারণ করল, 'সু-উ-উ-ধার বোতল—'

সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে হল্লা শুরু হয়ে গেল, 'মাল বার কর মাসি, মাল বার কর।'

বৃন্দাবন বলল, 'ভাত খাওয়ার পর কেউ মাল খায়।'

পেনো বলল, 'তুমি আর বাগড়া দিও না মেসো। সুধা খাব তার আবার ভাতের আগে পরে কী?'

ফটিকরা চেঁচিয়ে উঠল, 'যা বলেছিস পেনো! বার কর গো মাসি—'

ঘর থেকে বোতলগুলো আর মাটির খোরা বার করে আনল মানদা, পটাপট ছিপি খোলা হয়ে গেল। তারপর খোরায় ঢেলে ঢেলে সবাই চুমুক দিতে লাগল।

এক টানে তার খোরাটা আধাআধি কাবার করে পেনো বলল, 'এতক্ষণে শালা জমেছে।'

কবরেজ আর বৃন্দাবন পাশাপাশি বসে ছিল। বৃন্দাবন বলল, 'হ্যাঁ গো মেসো আজ বুধবার, আজ তো ছিরাধিকের কাছে থাকবার কথা! ঢের রাত হয়ে গেল। বাড়ি যাবে না?'

সোম, বুধ, শুক্র আর রবি, এই চারদিন শ্রীরাধিকা অর্থাৎ বিয়ে করা বউর কাছে কাটায় শশী কবরেজ। বাকি দিন ক'টা মানদার কাছে। দ্রুত একবার মানদাকে দেখে নিয়ে সে বলল, 'আজ আর বাড়ি ফিরছি না, ভাবছি চন্দ্রাবলীর কুঞ্জেই থেকে যাব।'

মানদা চোখ মুখ কুঁচকে বলল, 'ঢ্যামনার মুখে আগুন।' কবরেজ সম্বন্ধে এটাই তার প্রেমের চরম প্রকাশ

বোতলের পর বোতল ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। মেয়ে এবং পুরুষ, সবাইর চোখ এখন লাল টকটকে। তাদের গলার স্বর জড়িয়ে যাচ্ছে। মাথা টলছে।

সবাই খাচ্ছে। একজন বাদ, সে টিয়া। এক কোণে চুপচাপ বসে ওদের লক্ষ করছিল টিয়া।

মাল খেতে বসলে আর হুঁশ থাকে না ফটিকের। কিন্তু খেতে খেতে হঠাৎ টিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এ্যাই, তুই খাচ্ছিস না যে শালী?'

টিয়া আস্তে করে বলল, 'আমি মদ খাই না—'

'মাইরি আর কি ! পয়সা খরচা করে জিনিস আনালাম। না খেলেই হল !'

মানদা বলল, 'না না বাবা, ও এসব খায় না—'

'আলবত খাবে। আমার পয়সায় যত ফালতু মালেরা খাবে আর আমার টেম্প‌রারি বউই শুধু খাবে না।' টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল ফটিক। পেনোকে বলল, 'ধর তো মাগীকে, হাঁ করিয়ে স্বগ্গের সুধা চাখিয়ে দিই।'

অত নেশার মধ্যেও মানদার মাথা বেঠিক হয় নি। সে বলল, 'কি করছ বাবা, টিয়া এসব পছন্দ করে না।' তার গলায় টিয়া সম্পর্কে কিছুটা সম্ভ্রমেরই সুর।

কালীমার্কা খেয়ে ফটিকের মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল। আরক্ত চোখে মানদাকে দেখতে দেখতে সে চিৎকার করে উঠল, 'ইউ সাট আপ শালী। পেনো—'

পেনো গলা পর্যন্ত মদ গিলে দাওয়ার ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ছিল। তার চোখ জুড়ে এসেছিল। অতি কষ্টে তাকিয়ে গোঙানির মতো শব্দ করে বলল, 'কে টিয়া চিনতে পারছি না গুরু। আমার শালা হয়ে গেছে।' আবার এলিয়ে পড়ল ; তক্ষুনি তার দু চোখ জুড়ে গেল।

'ঠিক হ্যায়, কারোকে দরকার নেই। আমিই খাওয়াচ্ছি। শালী সতীর বাচ্চা।'

কিন্তু টিয়ার কাছে যাবার আগেই সে উঠে পড়ল এবং দ্রুত উঠোনে নেমে সোজা নিজের ঘরে ঢুকে খিল আটকে দিল। এলো-মেলো পায়ে দুলতে দুলতে ফটিক তার ঘরের কাছে এসে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগল, 'এ্যাই টিয়া খোল্, খোল্ বলছি—'

টিয়া উত্তর দিল না।

ধাক্কার বদলে এবার লাথি চালাতে লাগাল ফটিফ, 'ইয়ার্কি

আমার ভাল লাগে না বলছি ; এ্যাই শুয়ারকা বাচ্চা। ফটিকের মধ্যে থেকে বেপরোয়া মাতাল খিস্তিবাজ নিষ্ঠুর একটা লোক বেরিয়ে আসতে লাগল যেন।

টিয়া এবারও সাড়া দিল না, দরজাও খুলল না।

ফটিক জড়িত স্বরে হল্লা করতে লাগল ; অশ্লীল খিস্তি দিতে দিতে বলল, 'বাজারে মাগীর দেমাক কত ! একেক শালা কিক ঝাড়ব, চোদ্দ পুরুষের নাম ভুলে যাবি।' বলতে বলতে টলমল পা আর মাথা খাড়া রাখতে পারল না ফটিক। হুড়মুড় করে ভেঙে পড়তে পড়তে হড়-হড় করে বমি করে ফেলল। তার এই এক ব্যাপার ; বেশি নেশা করে ফেললে বমি করে ভাসিয়ে দেয়।

ফটিক লক্ষ করে নি, অন্ধকারে আরেকজন তার পিছু পিছু উঠে এসেছিল। সে কুসুম। কুসুম করল কি, তাকে তুলে বলল, 'চল, আমার ঘরে। ও মাগীর পেছনে ঘুরে কী হবে ?'

ফটিক আবছা গলায় বলল, 'কে বাবা তুমি ?'

'আমি কুসুম।'

কুসুম মানে জানো ?'

'ফুল।'

'কী ফুল তুমি, ধুতরো না গ্যাঁদা ?'

'আমি ডুমুর ফুল।'

ফাইন বলেছিস। চল্, তোর ঘরেই যাই।' কুসুমের কাঁধে ভর দিয়ে তার ঘরে চলে গেল ফটিক। তার সারা শরীর বমিতে মাখা-মাখি হয়ে গিয়েছিল। কুসুম ফটিকের মুখ-টুক ধুইয়ে জামা-প্যাণ্ট ছাড়িয়ে একটা শাড়ি জড়িয়ে দিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল। একটু পর ফটিক ঘুমিয়ে পড়ল।

পরের দিন ভোর বেলা ঘুম ভাঙলে ফটিক দেখতে পেল কাঁকড়ার

দাঁড়ার মত দুই হাতে তাকে জাপটে ধরে শুয়ে আছে কুসুম। প্রথমটা ফটিক ভেবেই পেল না ; সে কুসুমের ঘরে এল কি করে। পরক্ষণেই চট করে সব মনে পড়ে গেল। এক ঝটকায় কুসুমকে সরিয়ে দিয়ে উঠে বসল সে। তারপর বাইরে বেরিয়ে এল।

এখনও ভাল করে সকাল হয় নি। দু-একটা ছাড়া মেয়েপাড়ায় সব ঘরেই দরজা এখন বন্ধ। পুব দিকের লাইনবন্দী ঘরগুলোর দাওয়ায় কুকুরের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে পেনো। পেনোর নিজস্ব কোন বাড়িঘর নেই ; শীত গ্রীষ্ম বারোমাস মেয়েপাড়ার বিকিকিনি বন্ধ হলে এর-ওর দাওয়ায় শুয়ে থাকে সে।

এইমাত্র মানদার ঘর থেকে বেরিয়ে অর্থাৎ চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে রাত কাটিয়ে বেড়ালের মতো চুপিসাড়ে শশী কবরেজ বেরিয়ে গেল।

ফটিক কোনদিকে তাকাল না। সোজা টিয়ার ঘরের কাছে এসে ডাকাডাকি শুরু করে দিল।

এদিকে কুসুমের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। সে কোন রকমে তার গায়ে কাপড়টা জড়িয়ে ছুটে এল। কুসুম বলল, 'কী হল' তুমি চলে এলে যে ?

ফটিক উত্তর দেওয়া দরকার মনে করল না। সমানে টিয়াকে ডেকে যেতে লাগল।

কাল রাত্রিরে কুসুম যখন প্রায় বেহুঁশ অসুস্থ মাতাল ফটিককে টিয়ার ঘরের বন্ধ দরজার সামনে থেকে কুড়িয়ে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়েছিল তখন ভেবেছিল দারুণ জিতে গেছে। কিন্তু এই মুহূর্তে যখন তার হাতের মুঠোর ফাঁক দিয়ে ফটিক বেরিয়ে গেল ক্ষোভে-দুঃখে-হতাশায় এবং প্রচণ্ড রাগে কুসুমের মাথার শিরাগুলো কট কট করে ছিঁড়ে যেতে লাগল। চিলের মতো কর্কশ সরু গলায় সে চেঁচিয়ে চারদিক তোলপাড় করে ফেলল, 'কাল যখন বমি করে ভাসিয়ে দিয়েছিলে তখন কে সেই নরক ঘেঁটেছিল ? মুখপোড়া খচ্চরের বাচ্চা !'

ঘাড় ফিরিয়ে ফটিক খেঁকিয়ে উঠল, 'শাট আপ ব্যাস্টার্ড !' বলেই আবার ডাকতে লাগল, 'টিয়া—টিয়া—টিয়া'

গলায় সবটুকু হিংসা, আক্রোশ আর রীষ ঢেলে টেনে টেনে কুসুম বলতে লাগল, 'টিয়া ! টিয়া ! কাল ও মাগী ঘরেই ঢুকতে দিলে না ; আবার তার পায়েই মুখ রগড়াতে যাওয়া হচ্ছে !'

কুসুমের চেঁচামেচিতে এ-ঘর সে-ঘর থেকে অন্য মেয়েরা বেরিয়ে পড়েছিল ; মানদাও বেরিয়ে এসেছে।

চোখমুখ কুঁচকে অত্যন্ত বিরক্ত গলায় মানদা কুসুমকে জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে তোর ; সকালবেলা চিল্লিয়ে যে পাড়া মাথায় করে ফেললি।'

কুসুম গলা নামাল না ; আরো কয়েক পর্দা চড়িয়ে এলোমেলো-ভাবে কাল রাত্তিরের ঘটনাটা বলল। সব শুনে ধমকে খিস্তিখাস্তা দিয়ে তাকে থামাল মানদা ; তারপর মোটামুটি একটা রফা করে দিল। ঠিক হল, কাল রাত্তিরটা ঘরে রাখার জন্য কুসুম ফটিকের কাছ থেকে কিছু টাকা পাবে। খানিক্ষণ গজ গজ করে শেষ পর্যন্ত তা-ই মেনে নিল কুসুম ; যা পাওয়া যায়।

সমস্যাটার মোটামুটি ফয়সালা করে দিয়ে মানদা বলল, 'সকাল-বেলা আর যেন খ্যাচাখেচি চেল্লামেল্লি না শুনি কুসমি। আবার গলা চড়ালে জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলব। যা ছুঁড়িরা, যে যার ঘরে যা –'

কুসুম ঘাড় গোঁজ করে চুপচাপ তার ঘরে চলে গেল বটে, কিন্তু মুখ দেখে মনে হল না খুব খুশী হয়েছে।

এদিকে টিয়া দরজা খুলে দিয়েছিল। ফটিকের চোখের দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থেকে বলল, 'এসো—'

ঘরে ঢুকে তক্তাপোশে বসতে বসতে ফটিক উত্তেজনায় এবং রাগের গলায় বলল, 'কাল আমায় ঘরে ঢুকতে দিলি না যে ?'

টিয়া বলল, মাতালদের আমি ঘরে ঢুকতে দিই না।'

'কেউ মদ খাক তুই চাস না? তুনিয়া শালী তোর মতো সতী হয়ে যাবে?'

নিজের পয়সায় মদ খাবে; 'আমি আটকাবার কে? কিন্তু আমার ঘরে ঢুকে মাতলামো করবে, বমি করে ভাসিয়ে দেবে, সেটি চলবে না! সাফ কথা।'

ফটিক অবাক হয়ে যাচ্ছিল। বলল, 'মাতাল লুচ্চা বাস্টার্ড ছাড়া এ পাড়ায় ঢুকবে কে? তোর ব্যবসা চলে কী করে?'

খুব উদাসীনমুখে টিয়া বলল, 'যা চলে। আমি অতশত ভাবি না—

'তোর কিছু হবে না টিয়া।'

টিয়া উত্তর দিল না।

একটু কি ভেবে ফটিক বলল, তুই তো জুতো পায়ে লোককে ঘরে ঢুকতে দিস না, খিস্তিখাস্তা পছন্দ করিস না, মাল খেলে ঘরের দোর বন্ধ করে রাখিস। আর কী কী তোর ভাললাগে না তার একটা লিস্টি দে তো—'

টিয়া স্থির চোখে একপলক তাকিয়ে থাকল। তারপর বলল, 'আগে দেখি তোমার কী কী খারাপ অভ্যেস আছে। লিস্টি দিয়ে কি হবে। এখন যাও তো চান-টান সেরে এসো। কাল বমি করে ভাসিয়েছো; সে সব গায়ে লেগে আছে। তার ওপর ওই নোংরা শাড়ি পরে আছ; আমার গা ঘিন ঘিন করছে।'

ফটিকের পরনে কুসুমের তুর্গন্ধওলা চিটচিটে শাড়ি। শাড়িটা কিভাবে তার গায়ে উঠেছে, ফটিক ভেবে পেল না। অনেক চিন্তার পর আবছাভাবে তার মনে পড়ল, কাল রাত্তিরে কুসুমের ঘরে পরে থাকতে পারে। শাড়িটা গা থেকে না নামানো পর্যন্ত তার ভাল লাগছিল না; ঘেন্নায় গায়ের চামড়া যেন কুঁচকে যাচ্ছিল।

ফটিক বলল, 'এত সকালে আমি চান করি না; কিন্তু আজ করব।' পাজামা-তোয়ালে-ফোয়ালে নিয়ে বেরিয়ে গেল ফটিক।

কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে দেখল মাথায় তেল-টেল মেখে গামছা-শাড়ি-ফাড়ি কাঁধে চাপিয়ে টিয়া রেডি।

ফটিক জিজ্ঞাসা করল, 'তুই চান করবি নাকি?'

টিয়া মাথা নাড়ল, জানাল, রোজ সকালে চান করা তার অভ্যাস। জানিয়েই সে চলে গেল।

চান সেরে এসে টিয়া দেখল চুল-টুল আঁচড়ে ফিটফাট হয়ে বিছনায় বসে আছে ফটিক। একপলক তাকে দেখে আয়না-চিরুনি নিয়ে বসল টিয়া। চুলে চিরুনি চালাতে চালাতে বলল, 'সকালে কী খাও তুমি?'

ফটিক বলল, 'কী খাই জেনে তোর লাভ?'

'বা রে, আমার কাছে থাকবে বললে না? কোন্ বেলা কী খাও, কী কী খেতে ভালবাসো, আমার জেনে রাখতে হবে না!'

কথাটা ভাল লাগল ফটিকের। বলল, 'খাওয়ায় আমার বাছাবাছি নেই। যা দিবি তাই খাবো। তবে এখন একটু কড়া করে চা কর মাইরি।'

কাল রাত্তিরে প্রচুর বাঙলা মদ খেয়েছিল ফটিক। চান করবার পর শরীরটা যদিও অনেকখানি ঝরঝরে এবং টাটকা লাগছে তবু খোয়ারি পুরোপুরি কাটেনি। কড়া চা পেলে খোয়ারির মুখে বেশ লাগবে।

দ্রুত বার কয়েক চিরুনি চালিয়ে ভেজা চুলের ডগায় একটা গিঁট দিল টিয়া; তারপর তাড়াতাড়ি তক্তাপোশের তলা থেকে একটা কেরাসিনের স্টোভ বার করে চায়ের জল চড়িয়ে দিল।

ঘরে নোনতা বিস্কুট ছিল। চা হয়ে গেলে সস্তা চীনামাটির কাপে ঢেলে ফটিককে দিল টিয়া; দু'খানা বিস্কুটও সঙ্গে দিল। নিজেও এক কাপ নিল।

চা খেতে খেতে টিয়া বলল, 'দুপুরবেলা কী রান্না বান্না হবে?

ফটিক বলল, 'তোকে তো বলেই দিয়েছি খাওয়া দাওয়া নিয়ে আমার ঝুট ঝামেলা নেই; যা দিবি তা-ই খাব।'

টিয়া অল্প হাসল, 'লক্ষ্মী ছেলে।'

ফটিকও হেসে ফেলল, 'তা বলতে পারিস।'

একটু ইতস্তত করে খুব দ্বিধার গলায় টিয়া এবার বলল, আজ প্রথমদিন তুমি আমার কাছে খাবে। কিন্তু—'

'কিন্তু কী?'

'ঘরে চাল-ডাল ছাড়া কিচ্ছু নেই।'

'চাল-ডাল আছে তো? তা হলেই হবে। ফাইন একখানা খিচুড়ি পাকিয়ে ফ্যাল।'

'উঁহু, তা হয় না। কাকে দিয়ে যে বাজার করাই—' বলতে বলতে কি মনে পড়ে গেল টিয়ার, 'ঠিক আছে, পেনোকে পাঠাচ্ছি।'

টিয়া উঠতে যাচ্ছিল, ফটিকের হঠাৎ কি যেন খেয়াল হল। অত্যন্ত ব্যস্তভাবে সে বলে উঠল, 'তুই পাঠাবি মানে? পাঠাব তো আমি—'

দারুণ কুণ্ঠিতভাবে টিয়া বলল, 'খাবে বলে বাজার করে দিতে চাইছ! আমার কিন্তু ভীষণ খারাপ লাগছে।'

বিদ্যুৎ-চমকের মতো টিয়ার স্বভাবের একটা দিক ফটিকের কাছে ফুটে উঠল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে গাঢ় গলায় সে বলল, 'তুই একটা ব্লাডি মেয়েছেলে; কিচ্ছু হবে না তোর। কোথায় পয়সা খিঁচে নিবি তা নয়, নিজেই আমার জন্যে খরচা করতে চাইছিস। কী করতে যে এ-লাইনে এসেছিলি!'

দ্রুত ফটিককে একবার দেখে নিয়ে টিয়া চোখ নামাল।

চা খেয়ে একটু পর স্টীলের বাক্স থেকে মোটা মাণি ব্যাগ বার করে পকেটে পুরতে পুরতে বেরিয়ে গেল ফটিক।

এখন বেশ রোদ উঠে গেছে। বেলাও হয়েছে অনেকটা। এ পাড়ার বেশির ভাগ মেয়েই চান-টান সেরে দাওয়ায় বসে চা খাচ্ছে। কেউ কেউ চাল বাছছে; কেউ আনাজ কুটছে। রান্না বান্না চড়াবে, তারই আয়োজন আর কি।

ঘণ্টা দেড় তুই আগে মানদার ঘরের দাওয়ায় বুকের ভেতর হাত-পা মুড়ে গুঁজে বসে ছিল পেনো। এখন আর তাকে দেখা যাচ্ছে না। ঘুম থেকে উঠে কোথায় গেছে, কে জানে।

মানদা তার ঘরের সামনে বসে আনাজ কুটছিল। ফটিক শুধলো, 'পেনোকে দেখেছ নাকি ?'

মানদা বলল, 'পোড়ারমুখো এই তো ছিল ; বেরিয়ে গেছে বোধ হয়—'

মেয়েপাড়ার বাইরে এসে ফটিক দেখল, রাস্তার ওধারের দোকান-পাট খুলে গেছে। তাকে দেখে চায়ের দোকান, তেলেভাজার দোকান —সব জায়গা থেকে ডাকাডাকি করতে লাগল।

'কবে এয়েছ গো ফটকে দাদা ?'

'কাল—'

'এসো এসো। চা খাও। তোমার মুখে জাহাজের গপ্প শুনি।'

'এখন না, পরে আসব।'

'পরে কখন ?'

'এখন তো কিছুদিন আছিই। আসব'খন—' বলে ফটিক দোকানীদের সবাইকেই জিজ্ঞেসকরল, তারা পেনোকে দেখেছে কিনা। ওরা জানালো, ছ্যাখেনি।

খানিক দূরে নদীর পাড়ে উঁচু বাঁধের দিকে একবার তাকাল ফটিক, একবার তাকাল শ্মশানে যাবার রাস্তাটার দিকে, যদি পেনোকে পাওয়া যায়। কিন্তু না, কোথাও নেই সে। রীতিমত বিরক্ত হয়ে ফটিক বড় রাস্তা ধরে সোজা বাজার পাড়ার দিকে চলল।

ঘণ্টাখানেক পর নতুন একটা থলে বোঝাই করে তরি-তরকারি মাছ-মিষ্টি নিয়ে যখন সে ফিরে এল, দেখতে পেল, বৃন্দাবনের বাঙলা মদের দোকানের সামনে একটা বেঞ্চির ওপর বসে আছে পেনো। ফটিককে দেখে সে লাফিয়ে উঠল, 'উরি ব্বাস, গুরু করেছ কী !'

বলেই দৌড়ে এসে থলেটা ফটিকের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ফাঁক করে দেখতে দেখতে বলল, 'ইলিশ মাছ, ফুলকপি, আলু, পোনা মাছ, বাঁধাকপি, জলপাই, সন্দেশের বাক্স—মরে যাব ফটকেদা, আমি শালা স্রেফ মরে যাব। দুপুরে যা একখানা খ্যাঁট হবে না! এখন আর চা-ফা দিয়ে পেট বোঝাই করছি না; গুদোম খালি করে রাখছি। চল গুরু—' এক হ্যাঁচকায় থলেটা কাঁধের ওপর তুলে ফটিকের পাশাপাশি হাঁটতে লাগল পেনো।

ফটিক বলল, 'সক্কালবেলা উঠে কোথায় গিয়েছিলি রে মাকড়া? বাজারে পাঠাবার জন্যে কত খুঁজলুম।'

'নদীর পারে গিয়েছিলাম—'

কথা বলতে বলতে ওরা মেয়েপাড়ায় ঢুকে পড়ল। টিয়া এত মাছ-টাছ দেখে চোখ কপালে তুলে বলল, 'এ কী করেছ; এত কে খাবে?'

পেনো বলল, 'খাবার লোকের আবার অভাব। জম্পেস করে মাছ-ফাছগুলো তৈরি কর দিকি টিয়া। আমি ততক্ষণ মেসোর একটা কাজ করে দিয়ে আসি।'

পেনো চলে গেল। মেয়ে পাড়ার দালালি ছাড়াও কবরেজ, বৃন্দাবন আর মন্মথর কিছু কিছু ফাই-ফরমাস খাটে সে। তাতে চা-জলখাবার আর মাঝেমধ্যে বাঙলা মালের খরচাটা উঠে যায়।

টিয়া মাছ-টাছ কেটে চাল-ডাল ধুয়ে রান্না চাপিয়ে দিল। তার রাঁধবার জায়গা ঘরের সামনের দাওয়াটার একধারে। খানিক দূরে একটা কাঠের জলচৌকির ওপর জমিয়ে বসে গল্প করতে লাগল ফটিক। গল্প করা ছাড়া এখন আর তার কাজই বা কী।

ফটিক বলল, 'একটা ব্যাপারে আমি খুব অবাক হয়ে গেছি টিয়া।'

টিয়া উনুনে-চাপানো কড়ার দিকে তাকিয়ে বলল, 'অবাক কেন?'

'লাইফে এই ফার্স্ট নিজের হাতে বাজার করলাম আমি।'

'তার মানে?'

'তার মানে তাই।' ফটিক বলতে লাগল, 'জাহাজে জাহাজে ঘুরি। আমার যা কাজ সেটুকু করে ফেলতে পারলেই ব্যস আর ভাবনা নেই। সেখানে বাজার করবার ভাবনা নেই। কোন পোর্টে জাহাজ ভিড়লেই মাসখানেকের আটা-ময়দা-মাংস-মাখন কিনে রাখলেই হল; কেনবার জন্য আলাদা লোক আছে। রাঁধবার জন্যেও আলাদা লোক, খেতে দেবার জন্যেও। খিদে পেলেই মুখের কাছে খাবার এসে যায়।'

'জাহাজে কদ্দিন কাজ করছ?'

'ষোল সতের বছর।'

'তার আগে কোথায় থাকতে?'

'এই রাজানগরেই।'

ঘাড় ঘুরিয়ে টিয়া বলল, 'এখানে আসবার পর মাসির কাছে তোমার কথা শুনেছি।'

'তাই নাকি?'

'হুঁ। তখন থেকেই তোমাকে দেখতে খুব ইচ্ছে করত।'

ফটিক বলল, 'সত্যি!'

টিয়া বলল, 'মা কালীর দিব্যি; বিশ্বাস কর।'

একটা মেয়ে তাকে দেখবার জন্য উন্মুখ হয়ে বসে আছে; কথাটা দারুণ ভাল লাগল ফটিকের। সে বলল, 'বিশ্বাস করলাম।'

'তোমার কথা জানতেও ইচ্ছে করত।'

'আমার আবার কী কথা—'

'তোমার কে কে আছে, জাহাজে জাহাজে কেমন করে তোমার দিন কাটে—এই সব আর কী—'

'সেসব শুনবার মতো নয়। তোর কথা বল্ শুনি—'

টিয়া বলল, 'আমার কথা যেন কত শুনবার মতো! এই শরীর বেচে খাই। এখানকার আর পাঁচটা মেয়ের জীবন যেমন, আমারও তার থেকে আলাদা কিছু নয়।'

'উঁহু—'

'কী ?'

'না বললেই হবে, তুই সবার থেকে আলাদা। মেয়েমানুষ আমি কম ঘাঁটিনি, কিন্তু তোর মতো আর কারোকে তো দেখলাম না।'

প্রশংসায় টিয়া লজ্জা পেয়ে গেল। তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে কড়ায় মাছ চাপিয়ে দিল।

ফটিক আবার কী বলতে যাচ্ছিল, ওধারের একটা ঘর থেকে কুসুম এল। ফটিককে বলল, 'কি গো, একেবারে ফুত্তির জোয়ারে যে গা ছেড়ে বসে আছ। তা বেশ করেছ। কিন্তু আমার টাকাটার কী হবে ?'

ফটিক ভুরু কুঁচকে তাকায়, 'কিসের টাকা তোর ?'

'বাঃ বাঃ, বেশ! একটা গোটা রাত আমায় জড়িয়ে ধরে কাটালে, তার দামটা দেবে না ? মাসি তখন কী বলে দিলে ?'

মণিব্যাগ থেকে পাঁচ টাকার একটা নোট বার করে ছুঁড়ে দিল ফটিক। বলল, 'যা মাগী, ভাগ্ এখন—'

অশ্লীল মুখভঙ্গি করল কুসুম। তারপর টাকাটা কুড়িয়ে নিয়ে ঈর্ষাকাতর লোভী চোখে টিয়ার রান্নার রাজসূয় আয়োজন দেখতে দেখতে চলে গেল।

ফটিক বলল, 'তুই তো আমাকে খাওয়াবি বলে পয়সা খরচা করে বাজার করতে চেয়েছিলি। আর কুসুম ছ্যাখ কেমন করে পাওনা আদায় করে নিল।'

টিয়া বলল, 'যার যেমন স্বভাব!'

শুধু কুসুমই না, লুব্ধ বেড়ালের মতো এ-পাড়ার অন্য মেয়েরাও মাঝে মাঝেই এসে ঘুরে যেতে লাগল।

একটি মেয়ে, নাম তার জবা, বলল, 'কী রাঁধছিস লা টিয়া ?'

টিয়া বলল, 'ছ্যাখ না লোকটা কী কাণ্ড করে বসে আছে।

রাজ্যের বাজার করে এনেছে। মাছ-মাংস, কপির ডালনা—সব মিলিয়ে আট-দশখানা তো রাঁধতেই হবে।'

জবা বলল, 'বেশ বেশ। রাঁধ, মন ঢেলে রাঁধ। ভাল বাবু পেয়েছিস।' কথা সে বলছিল ঠিকই, কিন্তু তার চোখদুটো মাছের আঁশের মতো চকচক করছিল।

টিয়া আদরের গলায় বলল, 'এই জবা, দাঁড়িয়ে রইলি কেন? বোস না, চা করি, খা।'

জবা বলল, 'না ভাই, এখন আর বসব না। রান্না চড়াতে হবে।' বলে আর দাঁড়াল না। উঠোনে নেমে চলে গেল।

যারা জবার মতো চালাক-চতুর তারা এসে সহজভাবেই কথা-বার্তা বলল। যা কিছু ঈর্ষা আর লোভ শুধু তাদের চোখেই দপ দপ করতে লাগল।

কিন্তু যারা কুসুমের মতো তাদের চাউনিতে কথাবার্তায় হিংসে আগুনের ফুলকি হয়ে ঝরতে লাগল। তাদের কেউ বলল, 'ভাগ্যি একখানা করেছিস টিয়া, তাই এমন খদ্দের জুটল। আর আমাদের কপাল ছ্যাখ। একেবারে ভাঙা। যাক গে, ক'টা দিন ভাল খাবি, ভাল পরবি।'

টিয়া কিছু বলে না। মেয়েগুলো হিংসেয় পুড়ে পুড়ে আর বকে বকে ক্লান্ত হয়ে একসময় চলে যায়।

ওরা চলে গেলে ফটিক বিরক্ত গলায় চেঁচিয়ে, 'ব্লাডি ব্যাস্টার্ড কুত্তির দল।'

টিয়া সহানুভূতির স্বরে বলে, 'ওদের গালাগাল দিও না। বড্ড গরীব ওরা—'

ফটিক চাপা স্বরে গজ গজ করতে থাকে।

যাই হোক রান্নার ফাঁকে বার দুই চা করে ফটিককে দিল টিয়া ইলিশ মাছের ডিম হয়েছিল; চায়ের সঙ্গে সেই ডিমও ভেজে দিল।

চা খেতে খেতে ফটিক বলতে লাগল, 'নে, সোয়াইনগুলো ভেগেছে। এবার তোর কথা শুরু কর—'

'বললামই তো, আমার কথা শুনবার মতো নয়। যাচ্ছে তাই।'

'তা-ই শুনব।'

'এখন থাক, পরে শুনো।'

পেনো বলে গিয়েছিল, দুপুরে এসে খাবে। রান্নাবান্নার পর টিয়ারা অনেকক্ষণ বসে থাকল তার জন্য। তবুও সে যখন এল না, ফটিক বলল, আর কতক্ষণ বসে থাকব! আমরা খেয়ে নিই; পেনোর ভাগেরটা রেখে দে। ও এলে খাবে।'

'ওর স্বভাবই এই। কখনো ঠিক সময়ে আসবে না।' বলতে বলতে ঘরের মেঝেতে একটা ফুলকাটা আসন পেতে দিয়ে বড় কাঁসার থালায় ভাত সাজিয়ে দিল টিয়া; তার চারধারে গোল করে অনেকগুলো বাটিও সাজাল।

ফটিক বলল, 'আমি একলা বসব নাকি; তুইও নিয়ে বোস। একসঙ্গে গল্প করতে করতে খাই।'

'তুমি আগে খাও না; আমি পরে বসছি।'

'দূর—' টিয়া লাজুক হাসল, 'পুরুষ মানুষদের সঙ্গে বসে আমি খেতে পারব না।'

আসনে বসতে টিয়ার গালটা টিপে দিল ফটিক, 'তুই একটা রাবিশ; বিয়ে-করা মাগদেরও নাকে র‍্যাদা ঘষে দিতে পারিস।'

টিয়া এবার আর কিছু বলল না; মুখ নিচু করে আবার হাসল।

খেতে বসে প্রায় আঁতকে ওঠার ভঙ্গি করল ফটিক; ভঙ্গিটার মধ্যে রীতিমতো খুশি বিস্ময় আর উচ্ছ্বাস মেশানো। সে বলল, 'রান্নার সময় আমি তো তোর ঘরের কাছেই বসে ছিলাম; কখন এতসব রাঁধলি রে?'

টিয়া খুব নরম গলায় বলল, 'কাছে বসে ছিলে; দেখনি?'

ফটিক বলতে লাগল, 'মাছভাজা, আলুভাজা, কপির তরকারি, মাছের ঝাল, ঝোল, চাটনি! তুই মাইরি আজ আমাকে মেরেই ফেলবি।'

টিয়া বলল, 'কথা না বলে এখন খাও তো।'

খেতে খেতে ফটিক বলল, 'ফাস কেলাস তোর রান্নার হাত। বড় বড় হোটেলের বাবুর্চিদের কান কেটে নিতে পারিস।' বলতে বলতে গলার স্বর গাঢ় হয়ে এল, 'জানিস টিয়া, আজ আমার একজনের কথা মনে পড়েছে।'

টিয়া আগ্রহের সুরে বলল, 'কার?'

এই সময় বাড়িউলি মানদা একবাটি মাংস নিয়ে এল, কাল রাতের সেই বাসি মাংস। ফটিক তাকে বলল, 'আবার এসব আনতে গেলে কেন?'

টিয়া বলল, 'মাংসটা তুমি নিয়ে যাও মাসি। আমি অনেক রান্না বান্না করেছি; তা-ই খেয়েই শেষ করতে পারব না।'

মানদা বলল, 'যতই রাঁধিস, বাসি মাংসের সোয়াদই আলাদা।' এক রকম জোর করেই মাংসের বাটিটা দিয়ে সে চলে গেল।

আগের কথার খেই ধরে টিয়া বলল, 'তখন কার কথা যেন মনে পড়েছে বলছিলে?'

একটু চুপ করে থেকে ফটিক বলল, 'আমার মা'র, সেই কোন্ ছেলেবেলায় এই রকম কাছে বসে মা আমাকে খাওয়াত। একটু একটু মনে পড়ে।'

'কোন, বড় হবার পর মা আর খাওয়ায় নি?'

'তখন আর মাকে পেলাম কোথায়?'

'কেন, কী হয়েছিল?'

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকল ফটিক। তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগের সেই ছেলেবেলাটা বিদ্যুৎ চমকের মতো তার চোখের সামনে

ফুটে উঠল। দুঃখ-ক্ষোভ-রাগ এবং আবেগ, সব একাকার হয়ে অগুনতি ঢেউ তার মুখের উপর দিয়ে খেলে যেতে লাগল। কিছুক্ষণ পর উদাসীন সুরে ফটিক বলল, 'সে কথা শুনে কি আর হবে!'

টিয়া আড়ে আড়ে একবার ফটিককে দেখে নিয়ে বলল, 'তোমার কথা বড় জানতে ইচ্ছা করে।'

ফটিক কি বলতে যাচ্ছিল, পেনো এই সময় এসে হাজির। বাইরের বারান্দা থেকে চট করে একপলক ঘরের ভেতরটা দেখে বলল 'আমাকে ফেলেই বসে গেছ গুরু—'

ফটিক বলল, 'ক'টা বাজে হুঁশ আছে রে মাকড়া?'

ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে পেনো বলল, 'একটু লেট হয়ে গেল ফটকেদা—' বলেই নানা রকম সুখাদ্যে বোঝাই পাত্রগুলোর দিকে তাকিয়ে প্রথমে ঝুঁকে গন্ধ নিল। তারপর দারুণ খুশি আর দারুণ বিস্ময়ের গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'উরি ব্বাস, করেছিস কী টিয়া! আজ যা টানব না, স্রেফ শালা ফাঁসির খাওয়া। দে ভাই, খেতে দে।' চেঁচাতে চেঁচাতেই খালি মেঝেতে বসে পড়ল।

খেতে খেতে হাজার রকম হাসির কথা, রগড়ের গল্প করতে লাগল পেনো। হাসি আর গল্পের ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ কি মনে পড়ে গেল। তার এক ধারে টিয়া, আরেক ধারে ফটিক। চোখের মণিদুটো একবার ডাইনে, তারপরেই বাঁয়ে নিয়ে দু'জনকে দেখতে লাগল পেনো। আর ঠোঁট টিপে টিপে হাসতে লাগল।

টিয়া তাকে লক্ষ্য করেছিল। বলল, 'কী দেখছিস?'

'তাদের দেখছি। একটা কথা বলব মাইরি?'

'বল্ না—'

'হে-হে কথাটা হল—' এই পর্যন্ত বলে আচমকা থেমে গেল। তারপর খুব মজা করে একটু আগের মতো হাসতে লাগল।

টিয়া বলল, 'আহা, হেসেই যে মরলি। কথাটা বল্—'

হাসতে হাসতেই পেনো বলল, 'ফটকেদা যে ক'দিন আছে, তোকে আর নাম ধরে ডাকব না।'

'কী বলবি তা হলে?'

'বৌদি।'

টিয়া ঠোঁট টিপে বলল, 'পোড়ারমুখো।'

পেনো বলল, 'তোকে বৌদি না বললে ফটকেদার প্রেসটিজ পাংচার হয়ে যাবে না?'

বসে বসেই ঠ্যাং চালালো ফটিক, 'ব্লাডি কুত্তা কাঁহিকা—'

সত্যিসত্যিই দারুণ খাওয়া খেল পেনো। তার নিজের ভাষায় ফাঁসির খাওয়া। তারপর আর হেঁটে যাবার মতো অবস্থা রইল না; প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে কোনরকমে আঁচিয়েই কুসুমের ঘরের সামনের বারান্দাটায় টান হয়ে শুয়ে পড়ল। নিজের কোন ঘর বা থাকবার জায়গা নেই পেনোর; এর-ওর বারান্দায় বুকের ভেতর হাঁটু গুঁজে কুকুরের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর পার করে দিচ্ছে পেনো।

এদিকে আঁচিয়ে এসেই টিয়ার বিছানায় উঠল ফটিক। বালিশে ভর দিয়ে আধশোয়ার মতো করে বসে সিগারেট ধরাল। তাকে কয়েক কুচি সুপরি আর লবঙ্গ দিয়ে তাড়াতাড়ি নিজে খেয়ে বাসন-কোসন ধুয়ে মেঝের একধারে বসল টিয়া। জানলা দিয়ে হেমন্তের মরা হলুদ রোদ আসছিল। সেই রোদে পিঠময় চুল ছড়িয়ে শুকোতে শুকোতে বলল, 'এবার তোমার কথা বল। তখন পেনো এসে গেল; কথাটা আর শোনা হল না।'

ফটিক বলল, 'তোদের মেয়েদের এই এক কারবার। একটা কিছু ধরলে আর ছাড়তে চাস না। হাজার বার বলছি আমার লাইফের কথা শুনলে ভাল লাগবে না। যাক গে, এতই যখন ইচ্ছে, শোন্ তা হলে—'

ফটিকের ছেলেবেলার কথা, বাবার কথা, সেই মারোয়াড়ীর বাচ্চার সঙ্গে মার বেরিয়ে যাবার কথা, তারপর জাহাজে যাবার আগে পর্যন্ত দারুণ কষ্টকর দিনগুলোর ইতিহাস শুনতে শুনতে চোখ ছলছল করছিল টিয়ার ; গলার কাছটায় ব্যথা-ব্যথা লাগছিল. ঢোক গিলতে পারছিল না সে। আস্তে করে একসময় বলল, 'ছেলেবেলায় তোমার তো খুব কষ্টে কেটেছে।'

ফটিক হাসল, 'তা একটু কেটেছে।' বলতে গিয়েই আচমকা তার নজর গিয়ে পড়ল টিয়ার মুখের ওপর। এক মুহূর্ত থমকে থেকে অনেকখানি ঝুঁকে সে বলল, এ কি রে, তোর চোখে জল নাকি। তুই ব্লাডি একটা যাচ্ছেতাই।

টিয়া কিছু বলল না।

ফটিক আবার বলল, 'এ্যাই মাইরি, কাছে আয়। অদূরে বসে থাকলে কথা বলতে ভাল লাগে!'

নিঃশব্দে উঠে এসে তক্তাপোষের এক কোণে বসল টিয়া। ফটিক বলল, 'তোর মনটা তো ভারী নরম রে—' বলেই হাত বাড়িয়ে তাকে বুকের কাছে টেনে আনল।

টিয়া এতক্ষণে কথা বলল, 'আচ্ছা এখন তো তোমার জাহাজে জাহাজে কাজ?'

'হ্যাঁ।'

'নানা দেশে ঘুরে বেড়াতে হয় তো?'

'তা তো ঘুরতেই হয়।' ফটিক হাসল।

'আচ্ছা—' টিয়া জিজ্ঞেস করল, 'জাহাজে জাহাজে এই যে ঘোরো, বড় বড় সমুদ্দের ওপর দিয়ে যেতে হয়, না?'

'হুঁ। প্যাসিফিক, আটলান্টিক, রেড সী, ব্ল্যাক সী, নর্থ সী—সেই সব সমুদ্দুরের পাল কূল নেই রে টিয়া। দু-মাইল তিন মাইল জুড়ে একেকটা ঢেউ। সে তুই ভাবতে পারবি না টিয়া। একেকটা

ব্লাডি ব্যাস্টার্ড সী পেরিয়ে কোন পোর্টে পৌঁছতে পৌঁছতে মাসের পর মাস কেটে যায়।'

টিয়া বলল, 'আমার খুব দূর দেশে যেতে ইচ্ছে হয়, যদি পারতাম যেতে—'

ফটিক বলার জন্যই বলল, 'ঠিক আছে, ছুটি ফুরোলে এবার তোকে নিয়ে সমুদ্দুরে ভাসব।'

টিয়া হাসল। তারপর কী যেন বলতে যাচ্ছিল, ফটিক আবার বলল, 'আমার কথা আর না ; এবার তোর কথা বল্।'

'আমার আবার কী কথা ?'

'ল্যাও ঠ্যালা—' ফটিক বলতে লাগল 'তোকে দেখেশুনে এ লাইনের মেয়ে মনে হয় না ; এখানে এলি কি করে ?'

টিয়া একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আমি এ লাইনেরই মেয়ে।'

'ধুর—'

'কী ধুর ?'

'আমার বিশ্বাস হয় না।'

টিয়া হাসল, 'আমাকে দেখে এ-লাইনের মেয়ে বলে কেউ বিশ্বাস করে না, কিন্তু কথাটা সত্যি। আমিই না, আমার মায়েরও এই ব্যবসাই ছিল।'

ফটিক বলল, 'তুই মাইরি আমার মাথাটা খারাপ করে দিচ্ছিস।'

টিয়ার মুখে বিষাদের হাসি ফুটে উঠল। কিছুক্ষণ পর আবছা গলায় সে বলল, 'মা যা-ই থাক, তার ইচ্ছে ছিল অন্যরকম।'

পলকহীন টিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল ফটিক। আস্তে করে জিজ্ঞেস করল, 'কি রকম ?'

'মা'র বড্ড ইচ্ছে ছিল আমি যেন এ নরকে না থাকি। কিন্তু কি করব, আমার কপাল।'

এবার নকল বিরক্তি ফুটল ফটিকের চোখেমুখে। সে বলল,

'আধাখাঁচড়া না বলে গোড়া থেকেই শুরু কর না—' অর্থাৎ টিয়ার জীবনের আগাগোড়া ইতিহাসটাই জানতে চায় ফটিক।

গুছিয়ে গাছিয়ে টিয়া নিজের সম্পর্কে যা বলল তা এই রকম :

রাজানগরের এই মেয়েপাড়াটার মতোই বজবজের কাছে আরেক মেয়েপাড়ায় তার জন্ম। একটু বড় হবার পর মা আর তাকে সেখানে রাখেনি, একে-ওকে ধরে কলকাতার কাছাকাছি একটা সমাজ-সেবা প্রতিষ্ঠানে দিয়ে এসেছিল। প্রতিষ্ঠানটা মোটামুটি আশ্রমের মতো। অল্প খরচ-টরচ দিলে এখানে বাচ্চা ছেলেমেয়েদের রাখা হত ; লেখা-পড়া থেকে শুরু করে হাতের কাজটাজ শেখানো হত।

মা'র হয়তো ইচ্ছা ছিল, তার জীবনটা তো নরকেই কেটে গেছে, মেয়েটা অন্তত বাঁচুক। লেখাপড়া আর হাতের কাজ শিখে টিয়া যদি কোনদিন নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে যায়, এই জঘন্য নরকের জীবন তাকে ছুঁতে পারবে না। মেয়েটা বেঁচে যাবে। মা তার নিজের মতো টিয়ার কথা ভেবেছিল। তাকে বেশ্যাপাড়ার নাগালের বাইরে একটা সুস্থ ভদ্র রকমের ভবিষ্যৎ দিতে চেয়েছিল।

টিয়ার মনে আছে পাঁচ-ছ বছর সেই আশ্রমটায় ছিল সে, ক্লাস ফাইভ-সিক্স পর্যন্ত পড়েছিল। মা তার শরীর বিক্রির সামান্য আয় থেকে পয়সা বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে মাসের পয়লা সপ্তাহে আশ্রমের খরচ পাঠিয়ে দিত।

হয়তো মা যা চেয়েছিল তাই হত। তেমন করে লেখাপড়া কিংবা হাতের কাজ শিখতে পারলে বেশ্যাপাড়ার নরক হাত বাড়িয়ে তাকে কোনদিনই ধরতে পারত না। কিন্তু কিছুই হল না। আশ্রমে আসার ছ'বছর পর হুম করে বারকয়েক রক্তবমি করে মা মরে গেল। তখন কে আর আশ্রমে পড়ার খরচ চালায় তার? অসহায় ছেলেমানুষ টিয়া চোখের জলে বুক ভাসিয়ে বজবজের মেয়েপাড়ায় ফিরে গিয়েছিল এবং শুধু বেঁচে থাকার জন্য মা'র মতো রোজ রাত্তিরে

নিজেকে নিয়ে বিকিকিনি শুরু করে দিয়েছিল।

কিন্তু পাঁচ-ছ' বছরের আশ্রমজীবন এবং কিছু লেখাপড়া টিয়ার রুচি এবং মানসিক গড়ন তৈরী করে দিয়েছিল। যাকে-তাকে সে তার ঘরে ঢুকতে দিত না। মাতাল, জোচ্চোর, ফেরেব্বাজদের সে ঘৃণা করে।

বজ:জে বছর চারেক কাটিয়ে এখানে-ওখানে ভাসতে ভাসতে শেষ পর্যন্ত মাসকয়েক আগে এই রাজানগরে এসেছে টিয়া। মেয়ে-পাড়ায় এই জঘন্য কুৎসিত নরকের মাঝখানে নিজের রুচি আর আত্মসম্মানবোধ দিয়ে সে আলাদা একটা দ্বীপ তৈরী করে রেখেছে।

টিয়ার কথা শেষ হতে না হতেই ফটিক চেঁচিয়ে উঠল, 'ব্লাডি ব্যাস্টার্ড আর বলিস না। দু'দিনের জন্যে ফুর্তি করতে এসে এসব কষ্টের কথা ভাল্লাগে না। যত ঝুটঝামেলা। কষ্টের কথা বেশি শুনলে আমার ক্যারেক্টার খারাপ হয়ে যায়। তার চেয়ে আয়, কাছে আয়—' বলেই টিয়াকে জাপ্টে ধরে গাল কামড়ে দিল। খানিকক্ষণ উন্মত্তের মতো আদর করে আবার বলল, 'তোকে জড়িয়ে ধরে বড় আরাম রে; যেন শালা মাখন—বাটার। আর কাল রাত্তিরে একটা কেঠো ফ্যাসা মাছ ধরে যেন শুয়েছিলাম।'

'ফ্যাসা মাছ!'

'হ্যাঁ রে, ওই যে কুসমি। শালীর শরীরে মা সেব চাইতে কাঁটা বেশি; জড়িয়ে ধরলে গায়ে ফোটে।' বলে টিয়াকে আবার বুকে পিষে, গালে গাল ঘষে, নাক কামড়ে দারুণ খ্যাপামি শুরু করে দিল ফটিক। একটু আগে কষ্টের কথায় আবহওয়াটা ভ্যাপসা স্যাঁতসেঁতে হয়ে উঠেছিল। ফটিকের ভেতর থেকে একটা দুর্দান্ত, বেপরোয়া, পয়সা-দিয়ে-ফুর্তি-করতে আসা লোক বেরিয়ে এসে সেই আবহাওয়াটাকে ঘাড় ধাক্কা দিতে দিতে টিয়ার ঘরের বাইরে বার করে দিল।

সেই বিকেল পর্যন্ত ওরা শুয়ে থাকল। তারপর জানলা থেকে

যখন হেমন্তর রোদ সরে গেল, বাতাস দ্রুত জুড়িয়ে যেত লাগল সেই সময় টিয়া বলল, 'ছাড়ো, এবার উঠি।'

ফটিক বলল, 'থাক না আরেকটু।'

'না-না, একটু পর সন্ধ্যে হয়ে যাবে। গা ধোয়া আছে, চুল বাঁধা আছে—'

ফটিক ছেড়ে দিল।

টিয়া গা ধুয়ে, চুল বেধে, কেরোসিন স্টোভে চা বসিয়ে দিল। ফটিক বিছনাতেই চিত হয়ে শুয়ে থাকল। তার উঠতে ইচ্ছা করছিল না ; খুব আলস্য লাগছিল।

চা খাবার পর শরীরটা ঝরঝরে হল। বিছানায় বসে হাই তুলে পটপট করে বারকয়েক তুড়ি দিল ফটিক। তারপর বলল, 'এখন কী করবি টিয়া।

টিয়া বলল, 'কি আর করব !'

একটু ভেবে ফটিক বলল, 'এই সন্ধ্যেবেলা ঘরের ভেতর বসে থাকতে আর ভাল লাগছে না। অনেকদিন সিনেমা-টিনেমা দেখি না, চল্ একটা দেখে আসি।'

খুব একটা অনিচ্ছা নেই টিয়ার। এই বন্ধ ঘরে আবছা অন্ধকারে বসে থাকতে তারও খুব ভাল লাগছিল। বেশ আগ্রহের গলায় টিয়া বলল, 'চল।'

'কী পিকচার দেখবি ?'

'ইন্দ্রাণী টকীজে নতুন বই এসেছে, সবাই বলছে খুব ভাল হয়েছে।'

'চল ইন্দ্রাণী টকীজেই যাই।'

টিয়া শাড়ি পাল্টে সেজেগুজে নিল। ফটিক ট্রাউজারের ওপর লম্বা লম্বা ডোরা-দেওয়া কলারওলা দামী গেঞ্জি এবং জ্যাকেট চাপাল। তারপর ঘরে তালা ঝুলিয়ে তুজনে বেরিয়ে পড়ল।

এখন আর রোদ নেই। ঠিক সন্ধ্যে হয় নি, তবে চারধার ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। একটু পরেই এ-পাড়ায় বিকিকিনির বাজার বসে যাবে। এখন চারদিকে তারই আয়োজন চলছে। মেয়েরা কেউ কেউ সাজছে, কারো কারো সাজা হয়ে গেছে। অন্ধকারটা নামার শুধু অপেক্ষা, সবাই তখন দল বেঁধে সদরের কাছে গিয়ে দাঁড়াবে।

টিয়াদের দেখে ওরা মুখ তুলে তাকাল। কেউ কেউ হাসল, হিংসেয় কারো বুকের ভেতরটা পুড়ে যেতে লাগল।

মানদা তার ঘরের দাওয়ায় পানের ডাবা নিয়ে বসে ছিল। একগাল হেসে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় চললে বাবা?'

ফটিক বলল, 'সিনেমা দেখতে।'

'যাও বাবা, যাও। বাজার পাড়ার সিনেমা হলে একটা ঠাকুর দেবতার বই এসেছে – ভক্ত পেল্লাদ। আমায় একদিন দেখিয়ে দিও—'

'আচ্ছা—'

ফটিকরা এগিয়ে গেল। পেছন থেকে মানদা অনেকটা নিজের মনেই বলল, 'দুটিকে যা মানিয়েছে, যেন হরগৌরী।'

ওধারে নিজের ঘরের দাওয়ায় বসে চুল বাঁধতে বাঁধতে হিংসেয় জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছিল কুসুম। জোরে জোরে দ্রুত বারকতক চুলে চিরুনি চালিয়ে সে এক ঝটকায় মুখ ঘুরিয়ে নিল। চাপা বিষাক্ত গলায় বলল, 'হর গৌরী! মাসি চোখের মাথা খেয়ে বসেছে।'

টগর শুনতে পেয়েছিল। বলল, 'হর গৌরী নইলে কী?'

'প্যাঁচা-পেঁচী।'

মেয়ে পাড়ার বাইরে বড় রাস্তায় আসতেই দেখা গেল ওধারের দোকানপাটগুলোতে আলো জ্বলছে। ওখানে এখন বেশ ভিড়; বিশেষ করে তেলেভাজা এবং চাটের দোকানগুলোতে আর বৃন্দাবনের দিশী মদের দোকানে। পেনোকেও ওখানে দেখা গেল। সে মেয়ে-

াড়ার জন্য খদ্দের যোগাড় করছে। কিভাবে নাকের ডগায় টোপ ঝোলাতে হয় তার টুকরো টুকরো কথা ভেসে আসছিল. 'একদম ডাঁসা ছুঁড়ি। ফুলকচিও আছে, ষোল-সতের-আঠার, যে বয়সের চাও দাদা—'ইত্যাদি।

সবাই ব্যস্ত; তাই কেউ ফটিকদের লক্ষ্য করল না। রাস্তা দিয়ে খানিকটা যাবার পর সাইকেল-রিক্সা পাওয়া গেল। ফটিক আর টিয়া তাতে উঠে বসল।

ইভনিং শো-তে সিনেমা দেখে ফিরতে ফিরতে একটু আগের দেখা ছবিটা নিয়ে ওরা আলোচনা করছিল।

টিয়া বলল, 'ছ'মাস পর সিনেমা দেখলাম, খুব ভাল লাগল। —কুমার যা করেছে না!'

ফটিক বলল, 'হিরোইন ছুঁড়িটাও ফাইন করেছে। গল্পটাও ফাস-ক্লাস। অনেকদিন পর বাঙলা সিনেমা দারুণ লাগল।' একটু ভেবে জিজ্ঞেস করল, 'রাজনগরে আর কী কী বাঙলা পিকচার হচ্ছে রে?'

কোন্ কোন্ হলে কী কী ছবি হচ্ছে টিয়া জানাল।

ফটিক বলল, 'একবার জাহাজে উঠলে দেড় দু বছরের আগে তো আর ফেরা হয় না। ভাবছি তুই আর আমি রোজ একটা করে বাঙলা সিনেমা দেখব।'

টিয়া বলল, 'আচ্ছা—'

কথায় কথায় ওরা মেয়েপাড়ার কাছাকাছি চলে এসেছিল। ডানধারে তেলেভাজা, চাট আর বাঙলা মালের সেই দোকানগুলোতে গ্যাসের আলো জ্বলছে। আর সেই আলোগুলোকে ঘিরে ভনভনে মাছির মতো মাতালদের ভিড়।

বৃন্দাবনের দোকানের সামনে একটা বেঞ্চির ওপর বসে ছিল পেনো। ফটিকরা সিনেমা যখন দেখতে যায় তখন পেনোর চোখে

পড়েনি ; এবার কিন্তু সে ওদের দেখতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে ঝট করে উঠে দাঁড়াল পেনো, 'উরি ব্বাস, গুরু যে—' বলতে বলতেই ছুটে এল, 'টিয়া – থুড়ি, বৌদিকে নিয়ে কোথায় গিয়েছিলে ?'

ফটিক বলল, 'সিনেমা দেখতে।'

ছবিটার নাম বলল ফটিক।

পেনো বলল, 'তিনবার দেখেছি। শালা টেরিফিক জিনিস।' নায়ক-নায়িকার নাম করে বলল, 'দু'জনে যা লড়েছে গুরু—'

ফটিক হাসল।

বাঙলা মালের দোকানের ভেতর থেকে বৃন্দাবনও ওদের দেখতে পেয়েছিল। তার গায়েই মন্মথর ফোটো তোলার দোকান। মন্মথ আর বৃন্দাবন ডাকাডাকি শুরু করে দিল, 'এই ফটকে, এদিকে আয়—'

সকালবেলা বাজারে যাবার সময়ও ওরা ডেকেছিল। এবার আর এড়ানো গেল না। গলা তুলে সে বলল, 'যাচ্ছি।' তারপর টিয়ার দিকে ফিরে বলল, তুই তোর ঘরে যা। আমি ওদের সঙ্গে একটু আড্ডা দিয়ে আসছি।'

'আচ্ছা—' টিয়া চলে গেল। আর পেনোকে সঙ্গে নিয়ে প্রথমে মন্মথর ফোটোর দোকানে এল ফটিক।

মন্মথর হাতে এখন কোন কাজ নেই। সারাদিনের বেশির ভাগ সময় কাজ থাকেও না। রাজানগরের সৌখিন বাজারপাড়া পেরিয়ে ক্বচিৎ কখনো কেউ তার কাছে ফোটো তোলাতে আসে। মেয়েপাড়ার বাসিন্দারা তেমন তেমন বাবু পাকড়াতে পারলে মাসে মধ্যে জোড়ে এসে ছবি তুলিয়ে যায় কিংবা মন্মথকে মেয়েপাড়ায় ডাকিয়ে বাবুর পাশে দাঁড়িয়ে যুগল-মিলনের ছবি তোলায়। তাছাড়া কাছেই শ্মশান ; দিনে কম করে পনের কুড়িটা মড়া আসে। তাদেরও ছবি তুলতে হয়। তবে সবার না। জীবনের পরপারে যারা চলে যাচ্ছে তাদের আত্মীয়-স্বজনদের সবার তো আর শেষযাত্রার ছবি তুলে রাখার মতো ক্ষমতা

বা ইচ্ছা থাকে না। গড়ে দৈনিক সাত-আটটা মড়ার ছবি তোলে মন্মথ। ফুলটুল দিয়ে সাজিয়ে প্রিয়জনেরা ফিরে বসে তাদের ফোটো তোলায় এ ছাড়া প্রায়ই কোন বিয়ে বা অন্নপ্রাশনের বাড়িতে মন্মথর ডাক পড়ে। মোটামুটি এই হল মন্মথর জীবিকা।

ওর সঙ্গে গল্প করতে করতেই হরিধ্বনি দিয়ে একটা মড়া এসে গেল। মড়া নিয়ে যারা এসেছিল তাদের একজন এসে খবর দিল, ফোটো তুলতে হবে। তাড়াতাড়ি ক্যামেরা আর ক্যামেরা বসাবার স্ট্যাণ্ড কাঁধে ঝুলিয়ে তার সঙ্গে ছুটল মন্মথ। যাবার সময় বলে গেল, একটু পরেই সে ফিরে আসছে। ফটিক যেন চলে না যায়। এই সময়টা সে যেন বৃন্দাবনের দোকানে বসে গল্প-টল্প করে।

ফটিক বলল, 'ঠিক হ্যায়।' পেনোকে নিয়ে সে বৃন্দাবনের বাঙলা মালের দোকানে এসে বসল।

ছোট একটা তক্তপোশের ওপর কোলের কাছে ক্যাশ বাক্স নিয়ে বসে আছে বৃন্দাবন। তার পেছনদিকে ধুলোপড়া পুরনো আলমারিতে সারি সারি কালীমার্কা বোতল সাজানো রয়েছে।

বৃন্দাবনের দোকানের সামনের দিকে অনেকগুলো বেঞ্চ পাতা; সেখানে তিন-চারটে লোক শালপাতার ঠোঙায় চাট নিয়ে মাটির ভাঁড়ে দিশী মদ খাচ্ছিল। দোকানের একটা ছোকরা তাদের অর্ডার-মাফিক মদ এনে এনে দিচ্ছিল।

বৃন্দাবন শুধলো, 'এবার রাজানগরে এসে কেমন লাগছে রে ফটকে?'

ফটিক বলল, 'অন্য বার যেমন লাগে।'

'উঁহু—'

'উঁহু কী?'

হেসে খ্যাসখেসে কেশো গলায় বৃন্দাবন বলল, 'টিয়ার সঙ্গে বেশ ভালই জমে গেছিস দেখছি।'

পেনো বলল, 'জমে একেবারে কুলপী মালাই। গুরু বেশ রসে-বশেই আছে গো জ্যাঠা।'

ফটিক আদরের ভঙ্গিতে পেনোর ঘাড়ে আলতো একটা চড় কষিয়ে দিল।

বৃন্দাবন বলল, 'তা অনেকদিন পর এলি ; একটু মালফাল খা—'

চট করে রাত্তিরের ব্যাপারটা মনে পড়ে গেল ফটিকের। মাল খেয়ে হল্লা-টল্লা একেবারেই পছন্দ করে না টিয়া। চুর মাতাল হয়ে গেলে আজ আবার ঝামেলা বাধিয়ে দেবে। ফটিক দোনামোনা করতে লাগল।

পেনো ফটিককে লক্ষ্য করেছিল, তার মনোভাব বুঝতেও পেরেছিল। গালের ভেতরটা চিবোতে চিবোতে বলল, 'বৌদির কথা ভাবছ নাকি ফটকেদা? বিয়ে-করা বউকেও লোকে এত ভয় পায় না।'

ফটিকের রূঢ় উদ্ধত স্বভাবের কোথায় যেন খোঁচা লাগল। হঠাৎ খেঁকিয়ে উঠল সে, 'এ্যাই শালা খচড়া, আমি ভয় করি? দে, মাল বার কর—'

'এই তো মরদকা বাত, হাতীকা দাঁত।'

যথারীতি পেনোর দিকে পা চালালো ফটিক ; তার আগে বেঞ্চি থেকে চট করে সরে গেছে পেনো।

একটু পরেই ফটিকের চোখ লাল টকটকে হয়ে গেল ; গলার স্বর এল জড়িয়ে। আস্ত একটা কালীমার্কা বোতল সাবাড় করে পেনোর কাঁধে ভর দিয়ে দিয়ে যখন সে মেয়েপাড়ায় ফিরে এল, ঘরে ঘরে রসের হাট বসে গেছে। কোন ঘর থেকে মাতালের জড়িত স্বর ভেসে আসছিল ; কোথাও হারমোনিয়াম বাজিয়ে গানের আসর বসেছে, কোথাও চিৎকার চলছে, কোথাও বা প্রচণ্ড হল্লা।

পেনোও দুচার ভাঁড় চড়িয়েছিল। হাত-পা-মাথা তারও টলছিল। ফটিককে বয়ে নিয়ে যেতে যেতে গান শুনে তার মেজাজ

এসে গেল। ডান হাতে তুড়ি দিয়ে দিয়ে চেরা গলায় সে গাইতে শুরু করল :

'ও যানেওয়ালে বালোমা—
লৌটকে আ, লৌটকে আ—'

ফটিক তার বুজে-আসা চোখ খুলবার চেষ্টা করে বলল, 'কে গাইছে রে?'

পেনো গোঙানির মতো শব্দ করে বলল, 'আশা ভোঁসলে—'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে।'

লম্বা উঠোন পেরিয়ে ওরা টিয়ার ঘরের সামনে এসে পড়ল। টিয়া তার দাওয়ায় দাঁড়িয়ে ছিল। ওদের এক পলক দেখেই চট করে ব্যাপারটা বুঝে নিল। তক্ষুনি ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল সে। ফটিক বাইরে থেকে ডাকতে লাগল, 'টিয়া—এ্যাই টিয়া—'

টিয়া সাড়া দিল না।

পেনো ডাকল, 'বৌদি—বৌদি—'

টিয়া নিরুত্তর।

এবার ফটিক এলোমেলোভাবে দরজায় ধাক্কা দিতে শুরু করে দিল, 'ডার্লিং মাই ডার্লিং—দরজা খোল মাইরি—'

পেনো বলল, খোল্ দিদি, নইলে গুরু মরে যাবে।'

ফটিক বলে যাচ্ছিল, 'হ্যাঁ, মরে যাবে। নির্ঘাৎ মরে যাবে। কোন শালা তাকে বাঁচাতে পারবে না।'

টিয়া ভেতর থেকে এতক্ষণে কথা বলল, 'কালই তোমাকে বলে দিয়েছিলাম না, মাতাল হয়ে আমার কাছে আসবে না?'

পুরো এক বোতল কালী-মার্কা ফটিকের মধ্যে রয়েছে। সেই ঝাঁঝালো উগ্র তরল এবার দারুণ উত্তাপ এবং উত্তেজনা সৃষ্টি করল। দরজায় আট-দশটা লাথি হাঁকিয়ে সে বলল, 'এ্যাই প্রস্টিটিউটকী বাচ্চী, খোল্ দরজা—আভ্ভী। শালীর বেশ্যাপাড়ায় গীতাপাঠ।'

টিয়া চুপ।

ফটিক আবার বলল, 'শালা পয়সা খরচা করে ফুর্তি করতে এসেছি!'

টিয়া বলল, 'তোমার কাছ থেকে এখনও একটা পয়সা নিইনি কিন্তু—'

আরো কিছুক্ষণ হল্লাবাজি করে করে দারজার কাছে হুড়মুড় করে পড়ে গেল ফটিক।

তারপরও পেনো খানিকক্ষণ দরজায় ধাক্কা দিয়ে দিয়ে জড়ানো গলায় টিয়াকে ডাকল। সাড়া না পেয়ে ফটিকের দিকে ফিরে বলল, 'গুরু যে এখেনেই লাট খেয়ে পড়ে রইলে! ও মাগী তো দোর খুলছে না, এখন কী করবে?'

ফটিক কিছু বলল কিন্তু বোঝা গেল না। তার গলার ভেতর থেকে ঘড়ঘড়ে একটা শব্দ বেরিয়ে এল।

পেনো আবার বলল, আমিও মাইরি আর দাঁড়াতে পারছি না। মাথাটা লাট্টু হয়ে যাচ্ছে, এবার স্রেফ লটকে পড়ে যাব। তুমি 'বস' আজ রাতটা বারান্দার দেয়াল জড়িয়ে শুয়ে থাকো। আমি হড়কে যাচ্ছি!'

পেনো ঝুঁকে ফটিকের থুতনি ধরে একটু আদর করল। ঠোঁট ছুঁচলো করে বলল, 'টা-টা ; কাল ফির মিলেঙ্গে।' বলেই টলতে টলতে উঠোনে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেল।

না ফটিক, না পেনো - ওরা কেউ লক্ষ্য করে নি অন্ধকারে কুসুম তার ঘর থেকে বিড়ালীর মতো জ্বলজ্বলে চোখে ওদের দেখছিল। পেনো চলে যেতেই সে বেরিয়ে এল। সোজা ফটিকের কাছে গিয়ে টানাটানি করে তাকে তুলে নিজের ঘরে নিয়ে গেল।

অনেক কষ্টে চোখের পাতা ফাঁক করে ফটিক জড়ানো অস্পষ্ট গলায় জিজ্ঞেস করল, 'তুই কে রে?'

কুসুম বলল, 'যাকে তুমি দেখতে পারো না, আমি-সে-ই গো। আমি তোমার দু-চোখের বিষ।'

গলার ভেতর ঘড়ঘড়ে একটা শব্দ করল ফটিক।

কুসুম আবার বলল, 'তোমার যে চোখের মণি সে তো মুখের ওপর দোর বন্ধ করে দিল। সারা রাত্তির বাইরে হিমের ভেতর পড়ে থাকবে, আর আমি মাগী ঘরের মধ্যে পড়ে পড়ে ঘুমুবো তা হয় না। তুমি আমায় দেখতে না পারলে কী হবে, তোমার জন্যে আমার টান আছে গো, টান আছে।'

ফটিক তার কথা কতটা শুনল আর কতটা শুনল না, সে-ই জানে। ঘরের চারধারে ঘোলাটে চোখে তাকাতে তাকাতে সে বলল, 'এটা তো টিয়ার ঘর না।'

'এতক্ষণে বুঝলে টিয়ার ঘরে আসো নি! আমার মরণ।'

'এটা কার ঘর রে?'

'আমার গো আমার; আমি কুসুম।'

আঙুলের ডগায় কুসুমের থুতনিটা তুলে ধরে টলতে টলতে ফটিক বলল, 'ইয়েস, কুসুমই তো—সেই কাঁটাওলা ফ্যাসা মাছ। অলরাইট ফ্যাসা মাছই সই। টিয়াকো নেহী মাংতা।' কুসুমকে ছেড়ে দিয়ে ঘাড়-টাড় গুঁজে ফটিক তার বিছানায় শুয়ে পড়ল।

পরের দিন সকালবেলা নেশা-টেশা ছুটে গেলে ফটিক টিয়ার ঘরে চলে এল। এই নিয়ে সেদিনের মতো কুসুম আবার কুৎসিত চিৎকারে গোটা মেয়েপাড়াটা কিছুক্ষণ সরগরম করে রাখল। তারপর একটা রাত নিজের ঘরে রাখার দাম হিসেবে ফটিকের কাছ থেকে পাঁচটা টাকা আদায় করে তবে চুপ করল এবং নিজের ঘরে চলে গেল।

এই সকালবেলা ফটিক একেবারে অন্য মানুষ। কাল রাত্রে যে নেশায় চুর হয়ে টিয়ার ঘরের সামনে হল্লা করেছিল তার সঙ্গে এই

ফটিকের আদৌ কোন মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। কাল রাতের ব্যাপারটার জন্য খানিকটা অনুতপ্তও সে। অপরাধীর মতো মুখ করে হাত কচলাতে কচলাতে ফটিক হাসল, 'বুঝলি মাইরি, আমার কোন দোষ ছিল না। ওই পেনো আর বেন্দাবন গ্যাস দিয়ে দিয়ে আমাকে বাঙলা মাল খাইয়ে দিলে।'

টিয়া উত্তর দিল না।

ফটিক আবার বলল, 'শালারা এমন খচ্চর, আমার কোন কথা শুনল না। শেষ পর্যন্ত ভাবলাম, অত করে বলছে, আচ্ছা এক ভাঁড় খাই। কিন্তু সত্যি কথা বলছি, ইন দি নেম অফ গড, মাল খেতে বললে আমার মাথার ঠিক থাকে না। এক ভাঁড়ের পর দু ভাঁড় খেলাম, দু ভাঁড়ের পর তিন ভাঁড়। এই করে করে গোটা বোতল ফাঁক হয়ে গেল।'

টিয়া এবারও চুপ।

ফটিক বলতে লাগল, 'এই নাক মুলচি কান মুলচি, আর যদি ওই মাকড়াদের পাল্লায় পড়ে মাল খাই! তখন তুই আমাকে যা ইচ্ছে বলিস।'

টিয়া একটা কথাও বলল না; শুধু বড় বড় চোখে পলকহীন তাকিয়ে থাকল।

ফটিক আরো খানিকক্ষণ বকে গেল, 'এই লাস্ট—শালারা আবার যদি মাল খাওয়াতে আসে এমন কোতকা মারব যে লাইফে ভুলবে না।' তারপর চান-টান সেরে চা খেয়ে কালকের মতো বাজারে চলে গেল।

দেখতে দেখতে ক'টা দিন কেটে গেল। এখন গোটা দিনটা এভাবে কাটে ফটিকের। সকালে উঠে চান-টান সেরে চা খাবার-দাদার খেয়ে বাজারে চলে যায় সে। সেখান থেকে ফিরে আরেক কাপ চা খায়। তারপর কোন কোন দিন টিয়া যখন রান্না চাপায় তার ঘাড়ের কাছে বসে গল্প করে যায়। নইলে ওই সময়টা বৃন্দাবন কি মন্মথর দোকানে কিংবা শশীর কবিরাজখানায় গিয়ে আড্ডা মারে।

ত্বপুরবেলা ফিরে এসে খেয়ে দেয়ে টিয়াকে নিয়ে শুয়ে পড়ে ; টানা একটি ঘুম লাগিয়ে বিকেলে উঠে আবার চা খায়। মেয়েপাড়ার ঘরে ঘরে যখন সাজগোজের ধুম পড়ে সেই সময় টিয়াকে সঙ্গে করে ফটিক কোনদিন যায় সিনেমায়, কোনদিন গঙ্গায় নৌকো ভাড়া করে বেড়ায়। কোন কোনদিন ভোরবেলা সোজা ওরা চলে যায় কলকাতায় ; সারাদিন হৈ-চৈ করে, হোটেলে খেয়ে লাস্ট ট্রেনে ফিরে এসে ছাখে মেয়েপাড়া ঘুমে ঢুলুঢুলু হয়ে আছে।

এদিকে অন্য মেয়েদের, বিশেষ করে কুসুমের মনে প্রথমদিকে যে হিংসেটা ছিল এখন আর সেটা তত স্পষ্ট নয়। টিয়ার সৌভাগ্যকে মোটামুটি তারা স্বীকার করে নিয়েছে। যার যেমন ভাগ্য ; তার ওপর তো কারো হাত নেই। কুসুম এবং অন্য হিংসুক মেয়েরা তাদের নিজেদের ধরনে যতটা সম্ভব ইদানীং টিয়াদের সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছে। গল্প করে, টিয়া আর ফটিকের সম্পর্ক নিয়ে ঠাট্টা টাট্টাও করে। টিয়া ভালো কিছু রাঁধলে সিলভারের বাটিতে বাটিতে ওদের ঘরে ঘরে পাঠিয়ে দেয়।

এই সবের মধ্যেও মাঝে মাঝে গোলমাল হয়ে যায়। ফটিকের রক্তের মধ্যে আঠারো-বিশ বছর ধরে যে নেশা আর বেপরোয়া উচ্ছৃ-ঙ্খলতা মিশে রয়েছে, একেকদিন সেগুলো মাথা চাড়া দিয়ে বেরিয়ে আসে। তখন নেশায় চুর হয়ে টিয়ার বন্ধ ঘরের দরজার সামনে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে সে। যেদিন কুসুমের ঘরে খদ্দের থাকে না, ফটিককে কুড়িয়ে নিয়ে যায়। আর যেদিন খদ্দের থাকে সারারাত হিমের মধ্যে টিয়ার ঘরের বারান্দায় পড়ে থাকতে হয় ফটিককে।

আমোদ করতে মজা লুটতে যারা সন্ধ্যের পর এই মেয়েপাড়ায় আসে, মাঝে মধ্যে তাদের সঙ্গে মারামারিও বাধিয়ে দেয় ফটিক। আজও সেরকম একটা ঘটনা ঘটল।

আজ বিকেলে টিয়াকে নিয়ে আর বেড়াতে বেরয়নি ফটিক। দুপুর-বেলা খাওয়া-দাওয়ার পর সে গিয়েছিল পঞ্চানন তলায় তাদের সেই পুরনো বাড়ি দেখতে। পেনো যা বলেছিল ঠিক তাই। তাদের বাড়িটা ঘাড় গুঁজে পড়ে আছে। দরজা-জানলা কিচ্ছু নেই—কারা খুলে নিয়ে চলে গেছে। ভাঙাচোরা টিনের চাল, ঘুণ-ধরা খুঁটি, বাঁশ ইতস্তত ছড়ানো।

খানিকক্ষণ খুব নিরাসক্তভাবে তাদের বাড়ির ধ্বংসাবশেষ দেখল ফটিক। তারপর উদ্দেশ্যহীনের মতো রাজানগরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে যখন সে মেয়েপাড়ায় ফিরে এল তখন সন্ধে হয়ে গেছে।

মেয়েপাড়ায় এখন, এই সন্ধ্যের অন্ধকারে একটা দারুণ মজার ব্যাপার চলছে। সেই সঙ্গে খানিকটা অস্বস্তিরও।

একটা মধ্যবয়সী বাবুমার্কা লোক টলতে টলতে মেয়েপাড়ার ভেতর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। গালের মাঝামাঝিপর্যন্ত তার জুলপি, কলপ-দেওয়া চুল সযত্নে মাথার ডান দিকে হেলিয়ে দেওয়া, চোখ ঢুলুঢুলু এবং আরক্ত। গাল ভাঙা এবং চোখের তলায় শ্যাওলার মতো কালচে ছোপ। ফিনফিনে কুঁচনো ধুতি সামনের দিকে লুটোচ্ছে, গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবীর তলায় সোনার হার দেখা যায়। এক পলকেই বোঝা যায় লোকটা পয়লা নম্বরের লম্পট।

তার সঙ্গে সঙ্গে মানদা এবং পেনোও যাচ্ছিল। আর দু-ধারের ঘরগুলো থেকে টগর কুসুম জবা-ময়নারা জ্বলজ্বলে লুব্ধ চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে সামনে ডাকাডাকি করছিল, 'আমার ঘরে আসুন কুণ্ডুবাবু, আমার ঘরে—'

কেউ বলছিল, 'অনেক দিন পর এবার এলেন, আমার কাছে রাত না কাটালে গলায় দড়ি দেব মাইরি।' কেউ বলছিল, 'সেবার বলে গিয়েছিলেন, পরে যখন আসবেন আমার কাছে থাকবেন।' কেউ বল-

ছিল, 'আপনার আশায় কতকাল ধরে দিন গুনছি গো কুণ্ডুমশায় ; আসুন আসুন –

যাকে উদ্দেশ্য করে এসব বলা সে কিন্তু কারো কথাই শুনছিল না। মাথা নাড়তে নাড়তে আর প্রবলবেগে দু-দিকে দু-হাত ছুঁড়তে ছুঁড়তে সে সমানে বলে যাচ্ছে, 'তুমলোগকা নেহী মাংতা। যত সব ভাগাড়ের কুত্তী। সে কোথায় ?

মেয়েগুলো খুব বাঁকাল। ওরা বুঝতে পারছিল কুণ্ডুমশাই নামধারী ওই পয়সা ওয়ালা বদমাস লোকটা তাদের ঘরে রাত কাটাবে না : তাই তীব্র হতাশায় এবং রাগে চাপা গলায় ওরা গজ গজ করছিল, মড়াখেগো খচ্চর, শকুনে তোকে খুবলে খুবলে খাক।'

পেনো লোকটার গায়ে ঝুলতে ঝুলতে এগিয়ে যাচ্ছিল। সে শুধলো, 'কার কথা বলছেন কুণ্ডুমশাই ?'

কুণ্ডু জড়ানো গলায় গোঙানির মতো শব্দ করে বলল, 'সেই যে রে সেই ছুঁড়িটা ; টিয়া যার নাম। গোঁফ গজাবার আগে থেকে প্রস কোয়ার্টারে যাওয়া-আসা করছি কিন্তু বেশ্যাপাড়ায় অমন জিনিস আর চোখে পড়েনি।

পেনো গলার ভেতর অস্পষ্ট আওয়াজ করল।

কুণ্ডু আবার বলল, 'প্রথম যেদিন দেখলাম সেদিন থেকেই মাগীটা আমার চোখের তারা হয়ে গেছে রে—'

পেনো বলল, 'চোখের তারা এখন চোখ থেকে ঠিকরে বেরিয়ে গেছে।'

কুণ্ডু খুব সম্ভব তার কথা শুনতে পায় নি। নিজের ঝোঁকেই সে বলে যেতে লাগল, 'এ পাড়ায় এই শালা ভাগাড়ের মধ্যে ছুঁড়িটার থাকবার মানে হয় না। এবার একটা মতলব নিয়ে তোমাদের এখানে এসেছি মাসি—'

মাসি অর্থাৎ মানদা ছিল পেনোর ঠিক পেছনেই। গলা বাড়িয়ে

সে জিজ্ঞেস করল, 'কী মতলব?'

'টিয়াকে আমি এ জায়গা থেকে নিয়ে যাব।'

'কোথায়?'

কুণ্ডু বলল, 'ওই নদীর ওপারে—' বলেই ঘুরে দাঁড়িয়ে আবছা অন্ধকারে নদীর দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিল, 'ওখানে আমার ইটখোলা আছে, তার গায়ে দোতলা বাড়ি করিয়েছি একখানা। টিয়াকে নিয়ে সেখানে পতিষ্ঠে করব মাসি –'

লোকটার প্রচুর পয়সা। স্বনামে-বেনামে তার কয়েক শ' বিঘে জমিজমা। তা ছাড়া দু-দুটো ব্রিক ফিল্ডও আছে: আর আছে সুদের কারবার।

মানদা কি বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই পেনো হঠাৎ বলে ফেলল, 'ও তাল ছাড়ুন কুণ্ডুমশায়।'

কপাল কুঁচকে গেল কুণ্ডুর; ঢুলু ঢুলু আরক্ত চোখ অতি কষ্টে খুলে সে বলল, 'কী বলছিস, এ্যাই শালা পেনো?'

'বলছি টিয়াকে পাবেন না।'

'পাব না!' কুণ্ডু অবাক।

'না—' পেনো সোজা কুণ্ডুর চোখের ভেতর তাকাল।

'কেন?'

'টিয়া আগে থেকেই 'বুকড' হয়ে গেছে। ওকে আর পাওয়া যাবে না।'

পেনোর কথায় কুণ্ডুর রক্তে উত্তাপ এবং উত্তেজনার সৃষ্টি হল। দাঁত খিঁচিয়ে সে বলল, 'মাইরি আর কি; 'বুকড' হয়ে গেলেই হল!' একটা অকথ্য খিস্তি দিয়ে আবার বলল, 'এ কি অন্যের বিয়ে-করা স্তিরি যে পাওয়া যাবে না! পয়সা ছড়ালে বারো-ভাতারি মাগীদের আবার পাব না! চল শালা, দেখি পাই কিনা—'

পেনো বলল, 'টিয়াকে বাদ দ্যান কুণ্ডুমশাই। পাড়ায় অন্য মেয়ে

আছে, যাকে ইচ্ছে পছন্দ করুন—'

'চোপ খচ্চরের বাচ্চা। আমি শালা এক বগ্‌গা একরোখা লোক, যাকে ভেবে এসেছি তাকেই চাই। নইলে রক্তারক্তি হয়ে যাবে।'

'কেন ঝুটঝামেলা করছেন মাইরি। কতবার বলছি, অন্য লোক টিয়াকে 'বুক' করেছে তবু কানে নিচ্ছেন না? শেষে একটা ঝঞ্ঝাট হবে। পয়সাওলা লোক আপনি; সবাই আপনাকে চেনে; শেষমেষ বেইজ্জৎ হয়ে যাবেন। তার চাইতে যা বলছি করুন। জবা আছে, টগর আছে, কুসুম আছে—সবাই ফেরেশ (ফ্রেশ) জিনিস দাদা, একেবারে ফুলকচি। গুড বয় হয়ে ওদের কারো ঘরে ঢুকে পড়ুন। ফুর্তি করুন, ফাত্তা করুন, বেন্দাবনের দোকান থেকে মাল-ফাল আনিয়ে আমাদেরও একটু-আদটু ভাগ দিন—'

পেনোর কথা শেষ হবার আগেই কুণ্ডু গলা ফাটিয়ে চিৎকার করল, 'শাট আপ শালা, শুয়োরের বাচ্চা। আমি আর কারোকে চাই না; স্রেফ টিয়াকে চাই। পাঁচশো, হাজার, যা লাগে কুছ পরোয়া নেই। মালের ঘোরে ঠাওর করতে পারছি না, টিয়ার ঘর কোনটা রে, দেখিয়ে দে—, বলেই ঘুরে টলতে টলতে আবার এগুতে লাগল।

পেনো পেছন থেকে সমানে চেঁচামেচি করতে লাগল, 'এ্যাই কুণ্ডুমশাই, আপনি দাদা একটা গড়বড় বাধিয়ে বসবেন। সাপের গত্তে কেন যে ন্যাজ ঢোকাতে শখ হচ্ছে!'

পেনোর প্রতিটি কথার ফাঁকে একবার করে ফুঁসে ফুঁসে উঠতে লাগল কুণ্ডু, 'চোপ্ শালা, চোপ্। জন্ম কেটে গেল মাগীপাড়ায়; এই বয়েসে আমাকে সাপের গত্ত দেখাচ্ছে!'

দূরে, মেয়েপাড়ার সদর দরজাটার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কুণ্ডুর ব্যাপারটা দেখছিল ফটিক। দেখছিল একদৃষ্টে প্রায় পলক-হীন। এতক্ষণ একটা কথাও বলেনি সে; এবার লম্বা লম্বা পা ফেলে সোজা কুণ্ডুর কাছে গিয়ে গলার কাছটা টিপে ধরল, 'ব্লাডি

সোয়াইন, ব্যাস্টার্ডকি বাচ্চা—তোমার অনেক টাকা হয়েছে শালা—'

জাহাজের বয়লারে কয়লা-দেওয়া শক্ত হাত ফটিকের। কুণ্ডুর চোখ আর আলজিভ প্রায় বেরিয়ে আসছিল ; তারই মধ্যে গোঙানির মতো শব্দ করে সে বলল, 'তুই কে রে গু-খেকোর ব্যাটা ?'

'তোর বাবা। নিকালো, ইঁহাসে আভ্ভি নিকালো। নইলে আই উইল কিল ইউ—লাইফ বিলকুল খতম করে দেব।'

কুণ্ডুর গালের কষ বেয়ে গ্যাঁজলা বেরিয়ে আসছিল। পেনো, মানদা এবং অন্য মেয়েরা টানাটানি করে দু'জনকে ছাড়িয়ে দিল। তারপর খানিকক্ষণ হাঁপিয়ে কিছুটা সুস্থ হবার পর কুণ্ডু রুখে দাঁড়াল। ফটিকের দিকে তেড়ে গিয়ে সে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, 'আমার গায়ে হাত দিয়েছিস ! আমি যদি এক বাপের ব্যাটা হই হারামির বাচ্চা তোকে দেখে নেব !' উত্তেজনায় রাগে তার শরীর বেঁকে যাচ্ছিল। কুণ্ডু অবশ্য ফটিকের খুব কাছে যেতে পারছিল না ; কেননা পেনো পেছন থেকে তার কোমরটা জাপ্টে ধরে রেখেছিল।

ফটিক তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, 'যা-যা, দেখনেবালে ! হোল ওয়ার্ল্ড ঘুরে এলাম, কেউ পারল না, এখন তুই দেখবি ! মারব এমন লাথ, হাড্ডি ঢিলে হয়ে যাবে।'

আরো কিছুক্ষণ চেঁচামেচি করল কুণ্ডু। তারপর দম ফুরিয়ে হাত-পা ভেঙে ঘাড় গুঁজে পড়ে গেল। তক্ষুনি পেনো পাঁজাকোলে করে তুলে তাকে কুসুমের ঘরে দিয়ে এল।

পরের দিন সকালে মেয়েপাড়ার সবাই এবং ফটিক লক্ষ্য করল পেনো আঠা দিয়ে এক টুকরো কাগজ টিয়ার ঘরের দরজায় সেঁটে দিচ্ছে। তার ওপর আঁকাবাঁকা হরফে ভুল বানানে লেখা রয়েছে 'ইহা গেরস্ত ঘর ; রশিকজনের এখানে প্রবেশ নিসেধ।'

মেয়েরা ঘাড় বাঁকিয়ে হাসল। বলল, 'পেনোটা খচ্চরের ধাড়ী।'

মানদা বলল, 'মুখপোড়ার মরণ !'

লেখাটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ফটিকের দারুণ মজা লেগে গেল। খুব একচোট হেসে পেনোর দিকে পা ছুঁড়ল সে, 'গেরস্ত ঘর ! ব্লাডি কুত্তা কাঁহিকা—'

কার্তিক মাস শেষ হয়ে এল। আজকাল বিকেল থেকেই হিম পড়তে শুরু করে। গাঢ় কুয়াশায় চারিদিক ঝাপসা হয়ে যায়।

হাওয়ায় এখন টান ধরেছে। উত্তুরে বাতাস ইদানিং আরো শুষ্ক এবং রসকষহীন। গাছের পাতা সজীবতা আর লাবণ্য হারিয়ে খসখসে হয়ে যাচ্ছে। হাতে-পায়ে এর মধ্যেই খড়ি পড়তে শুরু করেছে ; ঠোঁট ফাটছে। শীত যে আসছে, চারদিকে তারই ভূমিকা।

কার্তিকের শেষাশেষি এবার ভাইফোঁটার তারিখ পড়েছে।

একদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে চান-টান সেরে বিছানায় বসে চা খাচ্ছে ফটিক ; তলায় বসে চা খেতে খেতে খবরকাগজ পড়ে শোনাচ্ছে টিয়া ; (আজকাল টিয়ার জন্য একখানা করে বাঙলা খবর-কাগজ রাখে ফটিক) এই সময় টগর এল।

খবরকাগজটা একধারে নামিয়ে রেখে টিয়া বলল, 'এসো টগরদিদি, এসো। বোসো—'

টগর টিয়ার পাশেই বসে পড়ল।

টিয়া ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'ও কি, ও কি—খালি মেঝেতেই বসে পড়লে যে ! দাঁড়াও, তোমায় একখানা আসন পেতে দিই।'

টিয়া উঠতে যাচ্ছিল, তার কাঁধে একটা হাত রেখে ফের বসিয়ে দিতে দিতে টগর বলল, 'আসন দরকার নেই ; তুই বোস্ তো '

টিয়া বলল, 'তারপর টগরদিদি, 'পথ ভুল করে নাকি গো ?'

'আহা, আমি বুঝি তোর ঘরে আসি না—'

'কত আসো তা আমার জানা আছে। এ বছরে ক'দিন এসেছ, হাত গুনে বলতে পারি।'

টগর হেসে ফেলল, 'কম আসি, তা আমি মেনে নিচ্ছি বাবা। হাত আর গুনতে হবে না।'

টিয়া বলল, 'ঠিক আছে, গুনছি না। একটু বোসো, চা করি—'

'না-না, চা আর করতে হবে না।'

'তাই কখনো হয়, আমরা চা খাচ্ছি আর তুমি খালিমুখে বসে থাকবে! তা ছাড়া এ্যাদ্দিন পর এলে '

টগর হাসতে লাগল, 'তোকে নিয়ে আর পারা যায় না ছুঁড়ি—'

তক্তপোষের ওপর থেকে ফটিক বলল, 'সত্যিই ওকে নিয়ে পারা যায় না। ওর আদর-যত্নের ঠ্যালায় আমি গেছি।' বলল বটে, তবে ফটিকের চোখমুখ দেখে মনে হল, সুখের নদীতে ভাসছে।

টিয়া হাসতে হাসতে তক্তপোষের তলা থেকে কেরোসিনের স্টোভ বার করে কেটলিতে চায়ের জল চড়িয়ে দিল। তারপর টগরের কাছে ফিরে এসে বলল, 'এখন বল এই সকালবেলা হঠাৎ কী মনেকরে?'

টগর বলল, 'ভালোদাদার সঙ্গে একটা কাজের কথা ছিল—'

ফটিককে সেই কবে থেকে 'ভালো দাদা' বলে ডেকে আসছে টগর। ফটিকও তাকে বোনের মতোই দেখে। ফটিক বলল, 'কী কথা রে টগর?'

টগর বলল, 'কাল ক'তারিখ বলতে পার?'

মেয়েটা কী বলতে চায় ঠিক বুঝতে না পেরে ফটিক শুধলো, 'কেন, কালকের তারিখ দিয়ে কী হবে?'

'বলই না—'

মনে মনে হিসেব করে ফটিক বলল, 'আজ দশই নভেম্বর, তা হলে কাল এগারই—'

টগর জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল, 'উঁহু—উঁহু—'

'উঁহু কী?

'ইংরিজি তারিখের কথা তোমায় কে জিজ্ঞেস করেছে। আমি

বলছিলাম বাঙলা তারিখের কথা—'

'এই' সেরেছে! ওই ব্লাডি বাঙলা তারিখ ফারিখের খবর আমি রাখি না।

টগর হেসে হেসে বলল, 'দাদা আমার একেবারে সায়েব।'

টিয়া চোখের কোণ দিয়ে একপলক ফটিককে দেখে নিয়ে আস্তে করে বলল, 'শুধু গালাগাল দেবার বেলায়-'

টগর বলল, 'কাল হল বাঙলা কার্ত্তিক মাসের পঁচিশ তারিখ। কাল কী পরব আছে বল তো?'

ফটিক জিজ্ঞেস করল, 'কী পরব?'

'ভাই ফোঁটা গো, ভাইফোঁটা—'

'কাল ভাইফোঁটা নাকি!'

হুঁ। কাল তোমায় আমি ফোঁটা দেব।'

'নিশ্চয়ই দিবি।' ফটিক বলতে লাগল, 'আগেও তো আমাকে ভাইফোঁটা দিয়েছিস।'

এর আগে যেবার যেবার কার্তিক মাসে ফটিক এই রাজানগরে ছিল, টগর তাকে ভাইফোঁটা দিয়েছে। সে বলল, 'পত্যেক বছরই তো তোমার কপালে ফোঁটা দেবার ইচ্ছে ভালোদাদা কিন্তু সব বার তোমাকে পাই কোথায়?'

'কী করব বল্—আমার জাহাজের চাকরি; কোন্ বছর কোথায় ভেসে বেড়াতে হবে তার কি কিছু ঠিক থাকে! তোর হাতে সব বছরই ফোঁটা নিতে ইচ্ছে করে রে—,

'এই যে কথাটা বললে, আমার হাতে ফোঁটা নিতে ইচ্ছে করে, এতেই আমার প্রাণটা জুড়িয়ে গেল ভালোদাদা। যা পাপিষ্ঠ আমি; যে নরকে দিনরাত ডুবে আছি! তোমায় ফোঁটা দিতে পারলে বড় ভালো লাগে গো ভালোদাদা! মনে হয় শরীরটা পবিত্তির হয়ে গেল।' বলতে বলতে গলার স্বর ভারী হয়ে আসছিল টগরের।

তার কথাগুলো ফটিকের প্রাণের গভীরে কোন একটা জায়গা ছুঁয়ে গিয়েছিল। গাঢ় গলায় সে বলল, 'আমি একটা ব্যাস্টার্ডের বাচ্চা ; হোল লাইফ নরকের মধ্যেই পড়ে আছি রে। তোর ফোঁটা পেলে আমিও পবিত্তির হয়ে যাই। একেবারে হোলি ম্যান।'

অনেকক্ষণ চুপচাপ।

এর মধ্যে চা হয়ে গিয়েছিল। একটা কলাই-করা গেলাসে চা ছেঁকে টগরকে দিল টিয়া। আলতো করে গেলাসে একটা চুমুক দিয়ে টগর বলল, 'কাল আমার ঘরে টিয়া আর তুমি খাবে ভালোদাদা।'

টিয়া বলল, 'না—'

টগর ক্ষোভের গলায় বলল, 'না কেন !'

'কাল তুমি আমার এখানে খাবে। আর এখানেই তোমার ভালোদাদাকে ফোঁটা দেবে।'

ফটিক বলল, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ সেই ভাল। টিয়া ঠিকই বলেছে। কাল সকাল বেলা এখানে চলে আসবি।'

টগরের ক্ষোভ যাচ্ছিল না। সে বলল, 'আমি গরীব বলে বুঝি আমার ওখানে খাবে না ?'

ফটিক সস্নেহে বলল, 'দূর বোকা মেয়ে, অন্য অন্য বার তো তুই-ই খাওয়াস। ভাইফোঁটার দিনে একবার বুঝি আমার বোনটাকে খাওয়াতে ইচ্ছে করে না।

আসলে ব্যাপারটা অন্যরকম। শরীর বেচে ক'টা টাকাই বা রোজগার টগরের। তার থেকেই ভবিষ্যতের জন্য দু-চারটে পয়সা জমিয়ে রাখতে হয়। তাদের যা জীবন, একটু বয়েস হলে, গায়ের চামড়া কিঞ্চিৎ ঢিলে হলে কেউ ফিরেও তাকাবে না ; তখন শরীরে যতই দোকান সাজাও, বিকিকিনি এক কানাকড়িও না। শেষ বয়সের জন্য টগর যা সঞ্চয় করে রেখেছে, ফটিক চায় না তা থেকে মেয়েটা ঝোঁকের মাথায় খরচ-টরচ করে ফেলুক।

টগর কি বলতে যাচ্ছিল, ফটিক আবার তাকে বলল, 'কাল সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই এখানে চলে আসবি। সারাদিন এখানেই থাকবি।'

টিয়া বলল, 'এসো কিন্তু টগরদিদি। দু'জনে মিলে এখানে রাঁধাবাড়া করব।'

টগরের চোখে প্রায় জল এসে গিয়েছিল। সে বলল, 'আসব রে আসব। এমন আদর করে কেউ কোনদিন আমায় কাছে ডাকে নি।' তারপর আরো কিছুক্ষণ গল্প-টল্প করে টগর চলে গেল।

ফটিক এবার টিয়াকে বলল, 'ভাইফোঁটার জন্যে ভালো রান্নাবান্না যখন হচ্ছেই তখন পাড়ার মেয়েগুলোকেও খেতে বলি। আমরা খাব আর মেয়েগুলো মুখ শুকিয়ে থাকবে, এ আমার ভালো লাগবে না।'

টিয়া বলল, 'সে তো ঠিক কথাই।'

'তা হলে চ' সবাইকে 'ইনভাইট' করে আসি।'

ওরা শুধু পাড়ার মেয়েদেরই খেতে বলল না, ঘুরে ঘুরে পেনো-বৃন্দাবন-মন্মথ আর শশী কবিরাজকেও নেমন্তন্ন করে এল।

পরের দিন সকালবেলাতেই এ পাড়ার সব মেয়েরা এসে হাজির। মানদা-কুসুম-পাখি জবা—সবাই আনাজ কেটে, বাটনা বেটে, মাছ কুটে, মাংস ধুয়ে টগর আর টিয়ার রান্নাবান্নায় সাহায্য করল।

ঠিক দুপুরবেলা পাঁজিতে সময় মিলিয়ে টগর ফটিককে ফোঁটা দিল।

'আমার ভাইকে দিলাম ফোঁটা,
যমের দোরে পড়ল কাঁটা।'

টিয়া এই সময় গাল ফুলিয়ে শাঁক বাজাতে লাগল ; অন্য মেয়েরা সরু ফিনফিনে জিভ নেড়ে ঘন ঘন উলু দিতে লাগল।

ফোঁটা দিয়ে টগর গলায় আঁচল জড়িয়ে ফটিককে প্রণাম করল। তারপর তার হাতে একখানা ধুতি আর সন্দেশের বাক্স দিল।

ফটিকও আগে ভাগেই চারখানা শাড়ি, নতুন ব্লাউজ, সায়া, জুতো, স্নো-পাউডার, আলতা কিনে রেখেছিল। টগরের হাতে সেগুলো তুলে দিল। সেই সঙ্গে নগদ পঁচিশটা টাকাও দিল।

তারপর খাওয়া-দাওয়া। খেতে খেতে দুপুর গড়িয়ে গেল। বিকেলের দিকে টগর বলল, 'আজ আর এখানে পড়ে থাকতে ইচ্ছে করছে না গো ভালোদাদা। থাকলেই তো সন্ধেবেলা ভাগাড়ের শকুনগুলো খুবলে খেতে আসবে। ভাইফোঁটার দিনে আমি নরক ঘাঁটতে পারব না। তুমি আমায় কোথাও নিয়ে চল না—'

'কোথায় যাবি?'

'যেখানে তোমার ইচ্ছে। শুধু একটা দিনের জন্যে এই নরককুণ্ড থেকে আমায় বার করে নিয়ে যাও।'

'ঠিক আছে, চল্ ইভনিং শো-তে একটা সিনেমা দেখে আসি।'

সন্ধ্যের আগে আগে টগর আর টিয়াকে নিয়ে রাজানগরের মেয়েপাড়া ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল ফটিক।

ভাইফোঁটার পর থেকে হাসি খুশি এবং আনন্দে দিনগুলো চমৎকার কেটে যাচ্ছে।

মোট কথা ফটিকের চল্লিশ বছরের বেপরোয়া উচ্ছৃঙ্খল এলোমেলো জীবনের কোথাও হয়তো আবছাভাবে একটা শান্ত মধুর স্নেহসিক্ত ঘরের ইচ্ছা ছিল। এবার রাজানগরে আসার পর টিয়া যেন সেই ইচ্ছাটাকে মনের ভেতর থেকে বার করে উস্কে দিচ্ছে। দুনিয়ার নানা বন্দরে ঘুরে ঘুরে কম করে হাজার খানেক মেয়ে কি আর সে ঘাঁটে নি? তাদের হল 'ফেল কড়ি মাখো তেলে'র কারবার। আগে পয়সা, তারপর যত পার গায়ের গন্ধ শোঁকো।

কিন্তু টিয়া মেয়েটা একেবারে আলাদা ধাতের, ফটিকের সব ক্ষ্যাপামি আর মত্ততা সে দ্রুত জুড়িয়ে দিচ্ছে।

অনেকদিন পর এবার রাজানগরে এসে খুব ভাল লাগছে ফটিকের। সেই যে প্রথম দিন বাস থেকে নামবার পর পেনো বলেছিল, 'টিয়া মেয়েটা দারুণ,' কথাটা ষোল আনার জায়গায় আঠারো আনা সত্যি। এমন মেয়ে জীবনে কখনও দ্যাখে নি ফটিক।

একদিন মাঝ-রাত্তিরে মেয়েপাড়ায় বেচাকেনা শেষ হলে চারদিক যখন নিঝুম হয়ে আসছে সেই সময় মানদার ঘরের দাওয়ায় বসে পেনো মাউথ অর্গ্যান বাজাচ্ছিল। মাঝে মাঝে খেয়াল হলে হিপ পকেট থেকে ওটা বার করে বাজায় সে।

অঘ্রান মাসের গোড়ায় এই মধ্য রাতে আকাশের মাঝ-মধ্যিখানে রুপোর থালার মতো গোল একখানা চাঁদ উঠেছে। কুয়াশা আর হিমে চারদিক ঝাপসামতো। অল্প অল্প হাওয়াও দিচ্ছে নদীর দিক থেকে। নিস্তব্ধ হেমন্ত রাত্রির পটে পেনোর মাউথ অর্গ্যানের সুরটা যেন এই জঘন্য কুৎসিত মেয়েপাড়ায় স্বপ্ন নামিয়ে আনছিল।

আর সেই সময় টিয়ার ঘরের তক্তপোষে পাশাপাশি শুয়ে টিয়া আর ফটিক কথা বলছিল।

ফটিক বলছে, 'এই রাজানগরে আমার জন্ম। কুড়ি বছর বয়েস পর্যন্ত এখানেই থেকেছি। তারপর জাহাজে চাকরি নিয়ে কতবার এখানে এলাম, কতবার এখান থেকে গেলাম তার ঠিকঠিকানা নেই। কিন্তু কোনবারই রাজানগরকে এত ভাল লাগে নি।'

টিয়া জিজ্ঞেস করল, 'কেন?'

বুকের ভেতর টিয়াকে ঘন করে জড়িয়ে ধরে ফটিক বলল, 'তোর জন্যে।'

'আহা—'

'আহা না রে, সত্যি।'

একটু চুপ। তারপর কি চিন্তা করে টিয়া বলল, 'কতদিন ভেবেছি তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস করব ; পারি নি।'

'কী কথা রে ?' ফটিক টিয়ার মুখের দিকে তাকাল।

টিয়া বলল, 'তোমরা যে জলে জলে ঘোরো তাতে ভয় করে না ?'

'কিসের ভয় ?'

'জাহাজ ডুবেও তো যেতে পারে।'

ফটিক বলল, 'পারেই তো। মাঝে মাঝে যায়ও—' কোন্ কোন্ তারিখে কোন্ কোন লাইনের জাহাজ কোন সমুদ্রে, কোন উপসাগরে, কোন গালফ বা ক্রীকে ঝড়ের মুখে পড়ে কিম্বা ডুবো জাহাজে ধাক্কা লেগে ডুবে গেছে গড় গড় করে তার লম্বা তালিকা দিয়ে গেল ফটিক।

আবছা উদ্বেগের গলায় টিয়া বলল, 'তা হলে বাপু তোমার আর জাহাজে গিয়ে দরকার নেই। জীবন নিয়ে যেখানে টানাটানি সেখানে কে যায়!'

ফটিক হাসল; কিছু বলল না।

টিয়া খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বলল, 'একটা কথা বলব ?'

'কী ?'

'জলে না ভেসে এখানেই একটা কাজকর্ম যোগাড় করে নেওয়া যায় না ?'

ফটিক হাসতে লাগল।

টিয়া শুধলো, 'হাসছ যে ?'

টিয়ার গালদুটো আদর করে টিপে দিয়ে ফটিক বলল, 'তুই বড্ড ভীতু—'

টিয়া বলল, 'তা তুমি যাই বল, এবার আর তোমার জাহাজে যাওয়া চলবে না।'

ফটিক আবার হাসতে লাগল।

আগের দিন রাত্তিরে ফটিক হেসেছিল ঠিকই কিন্তু টিয়ার কথাটা এক মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারেনি। পরদিন দুপুরবেলা খেয়ে-দেয়ে আর শুল না, বেরিয়ে পড়ল।

এই রাজানগরে কল-কারখানা তো আর কম নেই। কাঁচকল, চটকল, কাগজকল, স্টীল রোলিং মিল, ফাউণ্ড্রি—কলকাতা থেকে পনের-কুড়ি মাইল দূরে এই ছোট্ট শহরটা কারখানায় কারখানায় বোঝাই।

প্রথমে সে গেল একটা চটকলে। সেখানে বাইরে একটা বোর্ডে লেখা আছে: নো ভ্যাকান্সি। অর্থাৎ এখানে চাকরি-বাকরির আশা নেই।

চটকল ছেড়ে ফটিক এবার গেল একটা রঙের কারখানায়। ফ্যাক্টরির সুপারভাইজার গোছের একটা লোককে ধরে ফটিক বলল, 'স্যার একটা খোঁজ দিতে পারেন?'

'কী?' ভুরু কুঁচকে গেল সুপারভাইজারের।

'এই কারখানায় চাকরি-টাকরি খালি আছে?'

'চাকরি!' লোকটা এমনভাবে তাকাল যাতে মনে হয় শব্দটা জীবনে সে প্রথম শুনল।

অত্যন্ত বিনীতভাবে ফটিক বলল, 'হ্যাঁ; মানে আমার একটা কাজ দরকার—'

শরীরের গোপন অংশে আচমকা পোকা-টোকা কামড়ালে যেমন হয়, সুপারভাইজার প্রায় লাফিয়ে উঠল। মুখটা ছুঁচলো করে বলল, 'না-না, চাকরি-বাকরি এখানে নেই।'

'কোথায় পাওয়া যেতে পারে জানেন—'

'রাস্তায় গাদা গাদা পড়ে আছে; টুক করে কুড়িয়ে নিলেই হল। যত্তো সব—'

যদিও সম্ভব নয়, তবু ফটিকের ইচ্ছা করছিল, লোকটার ঘাড়ে

দশ-বারোটা লাথি কষিয়ে দেয়। শেষ পর্যন্ত ঘাড় গোঁজ করে সে বেরিয়ে এল।

পেইন্টের কারখানা থেকে বেরিয়ে একটা স্টীল রোলিং মিলে চলে এল ফটিক।

এখানে এসে কিন্তু ভেতরেই ঢুকতে পারল না; গেটের কাছেই দারোয়ান তাকে আটকাল। ফটিকের পা থেকে মাথা পর্যন্ত ধীরে-সুস্থে একবার দেখে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কিধার যাতা?'

ফটিক বলল, 'অন্দর।'

'কিসকো মাংতা?'

'ম্যানেজারকো।'

বিরুদ্ধ পক্ষের উকিলের মতো উল্টোপাল্টা জেরা শুরু করে দিল, দারোয়ানটা, 'ম্যানেজার সাবকা সাথ কিয়া কাম?'

বলবে কি বলবে না করেও শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলল ফটিক 'একটা নোকরি চাই।'

প্রকাণ্ড গোঁফওলা ভোজপুরী দারোয়ান প্রায় আঁতকে উঠল, 'নৌকরি! আরে বাপ রে বাপ—'

'কী হল!'

'নৌকরি কাঁহা! এহী কারখানামে তো আগেলা মাহিনামে 'রিটেচমেন' (রিট্রেঞ্চমেণ্ট) হোগী।'

'রিটেচমেন? সে আবার কী?'

'ছাঁটাই।'

এখানেও আশা ছেড়ে দিয়ে আরো দু-তিনটে কারখানায় ঘুরল ফটিক। কোথাও কর্মচারীদের মাথায় ছাঁটাইয়ের খাঁড়া ঝুলছে, কোথাও লক-আউটের নোটিশ লাগানো, কোথাও বড় বড় গোটা গোটা অক্ষরে লেখা আছে 'নো ভ্যাকান্সি।'

সারাদিন ঘুরে ক্লান্ত হয়ে মেয়েপাড়ায় ফেরার পর টিয়া শুধলো, 'গোটা দিনটা কোথায় কাটিয়ে এলে গো ?'

ফটিক উত্তর দিল না। বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়তে পড়তে বলল, 'এক কাপ চা কর তো টিয়া। ব্লাডি ড্যাম টায়ার্ড।'

টিয়া তক্ষুনি আর কিছু বলল না। তাড়াতাড়ি কেরাসিনের স্টোভ জ্বালিয়ে চায়ের জল চড়িয়ে দিল। খানিকটা পর চা ছেঁকে কাপে ঢেলে ফটিককে দিতে দিতে বলল, 'কই বললে না তো সারাদিন কোথায় ছিলে ?'

চায়ে লম্বা চুমুক দিয়ে ফটিক বলল, 'গিয়েছিলাম এক জায়গায়।'

'কোন জায়গায় ?'

'সে আছে।'

'আহা জায়গার যেন নাম নেই ?'

অল্প হেসে ফটিক বলল, 'রোম বার্লিন যাই নি রে বাবা, এই রাজানগরেই ছিলাম। ক'টা কারখানায় ঘুরে এলাম।'

টিয়া অবাক, 'কারখানায় আবার কী করতে গিয়েছিলে !'

'রগড় দেখতে।'

'আহা, রগড় দেখতে আবার কে কারখানায় যায়। বল না, কেন গিয়েছিলে ?'

'তুই বল্ দেখি—' ফটিক মজা করতে লাগল।

'টিয়া বলল, 'আমি কি করে বলব। আমি কি হাত গুনতে জানি ?'

'পারলি না যখন, আমিই বলি—' চা শেষ করে ফটিক বলল, 'চাকরি খুঁজতে গিয়েছিলাম।'

'চাকরি !' কথাটা যেন বিশ্বাস করতে পারল না টিয়া।

'হ্যাঁ রে, হ্যাঁ। 'সেদিন বললি না এখানেই একটা চাকরি-বাকরি দেখে নিতে।'

স্থির দৃষ্টিতে কয়েক পলক তাকিয়ে থাকল টিয়া ; আনন্দে আশায়

তার চোখের তারা চকচক করছিল। তাড়াতাড়ি তক্তপোষের কাছে চলে এল সে। গভীর আগ্রহে জিজ্ঞেস করল, 'চাকরি হল?'

ফটিক বলল, ঘোরাঘুরিই সার। হল এই—' বলে দু হাতের বুড়ো আঙুল নাচাতে লাগল।

মুখটা মলিন হয়ে গেল টিয়ার, 'চাকরি পেলে না তা হলে?'

'আ রে বোকা মেয়ে, অমনি মন খারাপ হয়ে গেল!' হাত বাড়িয়ে টিয়াকে খুব কাছে টেনে নিয়ে এল ফটিক। বলল, 'এক দিনেই কি চাকরি হয় রে; যা বাজার! বার বার যেতে হবে। তারপর দেখি লাকে কী আছে।'

'একটু ভাল করে চেষ্টা করো; নিশ্চয়ই কিছু না কিছু পেয়ে যাবে। এত কাজ জানো, এত দেশ দেখেছ, তোমার যদি চাকরি না হয় আর কার হবে!'

টিয়াকে বুকের ভেতর আরো ঘন করে টেনে এনে ফটিক বলল' 'আমারও সেই বিশ্বাস আছে রে—'

পরের দিন আবার কারখানায় কারখানায় ঘুরল ফটিক; তার পরের দিনও। এবং তারও পরের দিন। তারপর থেকে নিয়মিত ও দৈনন্দিন। শুধু রাজানগরেই না, আশেপাশে যত ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল টাউন আছে, এবং যে-সব জায়গায় ফ্যাক্টরি-ট্যাক্টরি আছে, সর্বত্র হানা দিল ফটিক। কিন্তু কোথাও এক শ' দেড়শ' টাকার একটা চাকরি জোটাতে পারল না।

এদিকে ছুটি ফুরিয়ে গেছে। তার পরও বারো-চোদ্দ দিন পার হতে চলল।

ফটিক এখানে এসেই দু-হাতে টাকা ওড়াচ্ছিল। এখন হাতে একটা পয়সাও নেই।

টিয়া যে এই মেয়েপাড়ায় থাকে তার জন্য মানদাকে প্রতিদিন ঘরভাড়া দিতে হয়। ফটিক আসার পর তার কাছ থেকে একটা পয়সাও নেয় নি সে ; ফটিক অবশ্য অনেকবারই দিতে চেয়েছে।

টিয়া করেছে কি, নিজের জমানো টাকা থেকে রোজ ভাড়া দিয়ে গেছে। কিন্তু এখন তার সামান্য সঞ্চয়টুকুও শেষ।

বাড়িউলি দু-তিন দিন ভাড়া না পেয়ে শেষ পর্যন্ত মুখ খুলল, 'কী ব্যাপার লো টিয়া, দু-তিন দিন ভাড়া দিচ্ছিস না—'

টিয়া চুপ করে রইল।

বাড়িউলি আবার বলল, 'ভাড়ার কথাটা ভুলে গেছিস নাকি ?'

কাচুমাচু মুখে টিয়া বলল, 'না না, ভুলব কেন ? আজ পারছি না মাসি, শিগ্গিরই দিয়ে দেব।'

তীক্ষ্ণ চোখে তার দিকে তাকিয়ে কিছু একটা আন্দাজ করতে চেষ্টা করল বাড়িউলি মানদা ; তারপর বলল, 'বুঝিস তো তোদের কাছ থেকে খুদকুঁড়ো নিয়ে তবেই আমাদের চলে।'

'তুমি ভেবো না, আমি ঠিক দিয়ে দেব।'

মানদা চলে গেল।

আরো দু-দিন পর ভাড়া-টাড়া না পেয়ে মানদা আবার তাগাদায় এল, 'কী হল রে মেয়ে, গরীবের ক'টা পয়সা দিয়ে দে—'

টিয়া ভয়ে ভয়ে বলল, 'তোমার পয়সা মার যাবে না মাসি। ঠিক দিয়ে দেব। এ্যাদ্দিন আছি, কোনদিন ভাড়া দিতে দেরি করেছি ?'

'না তো—'

'পয়সা নিয়ে তোমার সঙ্গে গোলমাল হয়েছে ?'

মানদা বলল, 'কক্ষনো না। আমিও তো তাই বলি ; রোজকার পয়সা রোজ যে গুনে দ্যায়, ভাড়ার জন্যে যার সঙ্গে কোনদিন খেচাখেচি করতে হয় না সে এইরকম টালবাহানা করছে কেন ?'

টিয়া উত্তর দিল না।

মানদা কি ভেবে আবার বলল, 'তা হ্যাঁ রে ছুঁড়ি, একটা কথা তোকে শুধোব ?'

টিয়া মুখ তুলল, 'কী ?'

'ফটিক টাকা পয়সা দিচ্ছে তো ?' মানদা সোজাসুজি টিয়ার চোখের ভেতর তাকাল।

টিয়া বিব্রতভাবে বলল, 'হ্যাঁ—হ্যাঁ, ছায় বৈকি, নইলে সংসার চলছে কী করে ?'

মানদা টিয়ার কথাটা পুরোপুরি বিশ্বাস করল না। চাপা নীচু গলায় গভীর কোন পরামর্শ দেবার মতো করে বলল, 'একেবারে গা ছেড়ে দিস না টিয়া। ওরা আসে ফুত্তি করতে, মজা লুটতে। যত পারিস ফটকের কাছ থেকে ছুয়ে নে। আখের বলে তো একটা কথা আছে।'

টিয়া কিছু বলল না ; মানদার দিকে এক পলক তাকিয়েই দ্রুত মুখ নামিয়ে নখ খুঁটতে লাগল।

মানদা আরো কিছুক্ষণ জ্ঞানের কথা বলে সেদিন চলে গেল। কিন্তু দিনকয়েক পর আবার সে ভাড়ার তাগাদায় এল। তারপর থেকে রোজ। চলতে-ফিরতে উঠতে-বসতে তাগাদার সঙ্গে গালাগালও শুরু হল। টিয়া মুখ বুজে সহ্য করতে লাগল।

পঞ্চাশ বছরের জীবনে মানদা অনেক দেখেছে ; জীবন সম্পর্কে তার বিপুল অভিজ্ঞতা। তাগাদা দিতে দিতে সে বুঝল, রোগটা অন্য জায়গায়। কিছুদিন পর টিয়াকে ছেড়ে আসল জায়গায় ঘা দিল। সোজা ফটিকের কাছে গিয়ে বলল, 'কুড়ি দিন টিয়া ভাড়া দিচ্ছে না ; তুমি দাও - '

তার গলার স্বরে চমকে উঠল ফটিক। বলল, 'দিয়ে দেব মাসি, দিয়ে দেব—'

'দিয়ে দেব না, কবে দেবে সেই তারিখটা জানতে চাই।'

'আমার হাতে নেই, যোগাড় করে দিয়ে দেব।'

রূঢ় কর্কশ গলায় মানদা আবার যা বলল তা এই রকম: পিরীতের পানসি ঢের চালানো হয়েছে, মাগ-ভাতারী খেলা যথেষ্ট হয়েছে, এখন দয়া করে মেয়েপাড়া ছেড়ে বিদেয় হও, টিয়াকে ব্যবসা পত্তর করতে দাও ইত্যাদি ইত্যাদি। সেই সঙ্গে অকথ্য খিস্তি, খেউড় এবং চিৎকার।

মানদার এই নতুন চেহারাটা দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছিল ফটিক। সেই মানদা যাকে সে মাসি ডাকে, যার মুখ থেকে সুধা ছাড়া আর কিছু কোনদিন ঝরতে দেখা যায় নি, সেই স্নেহপ্রবণ ভালোমানুষ মেয়েমানুষটি আর নেই। তার ভেতর থেকে রাজানগরের মেয়েপাড়ার জবরদস্ত খিস্তিবাজ এবং অত্যন্ত স্বার্থপর ঝগড়াটি বাড়িউলি বেরিয়ে এসেছে।

ফটিক বুঝতে পারছিল যতক্ষণ পয়সা ততক্ষণই খাতির। সে বলল, 'চিল্লিও না; সাতদিনের ভেতর তোমার সব পয়সা আমি মিটিয়ে দেব। যাও এখন ভেগে পড়। ব্লাডি সোয়াইন—,

মানদা বলল, 'ঠিক আছে। সাতদিন ঠোঁটে ঠোঁট টিপে থাকব। তারপর যদি টাকা না পাই কেষ্টবুলি কাকে বলে দেখিয়ে ছাড়ব।'

কিন্তু সাতদিনের ভেতর যখন কোন ব্যবস্থা হল না, মানদা চেঁচিয়ে খিস্তি করে মেয়েপাড়ার ভিত কাঁপিয়ে ছাড়ল। ফটিক একটা কথাও বলল না। একদৃষ্টে, পলকহীন তাকিয়ে থাকল শুধু। তারপর ঘরে ঢুকে তার সখের ট্রানজিস্টর আর রিস্টওয়াচটা নিয়ে বেরিয়ে গেল।

সন্ধ্যেবেলা রেডিও আর ঘড়িটড়ি বেচে ফিরে এসে ফটিক দেখল, টিয়ার ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। বাইরে চুলে-কলপ-লাগানো, গিলে-করা পাঞ্জাবি-ধুতি-পাম্পশুতে সাজা মধ্যবয়সী এক বাবুকে

নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মানদা। ঠিক দাঁড়িয়ে নেই, মানদা সমানে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে আর চেঁচাচ্ছে, 'দোর খোল নচ্ছার মাগী, দোর খোল। সতীগিরি ফলানো হচ্ছে! আমার টাকা আদায় করবই—'

ফটিক কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে মাসি? দরজা ধাক্কাচ্ছ কেন?'

তার গলা পেয়েই দরজা খুলে বেরিয়ে এল টিয়া। সেই বাবুটিকে দেখিয়ে ব্যাকুলভাবে বলল, 'পয়সা আদায় করবার জন্য মাসি ওই লোকটাকে আমার ঘরে ঢোকাতে চাইছিল।'

হঠাৎ কী হয়ে গেল ফটিকের, শরীরের সব রক্ত মাথায় গিয়ে চড়ল যেন, হিতাহিত জ্ঞান আর তার রইল না। ফুর্তি-লুটতে আসা মাঝবয়সী বাবুটিকে উন্মাদের মতো মারতে মারতে নাক মুখ থেঁতলে একটা রক্তারক্তি কাণ্ড বাধিয়ে পাড়ার বাইরে বার করেদিয়ে এল।

এদিকে চিলের মতো তীক্ষ্ণ সরু গলায় চেঁচাতে চেঁচাতে আর ফটিকের বাপ-মা-চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করতে করতে গলার শির ছিঁড়ে ফেলছিল মানদা, 'ওরে গু-খেকোর ব্যাটা, ওরে খচ্চর হাড়হাবাতে, এত বড় আস্পদ্দা তোর—আমার খদ্দেরের গায়ে হাত তুলিস, বেরো—এক্ষুনি বেরিয়ে যা—'

ফটিক গর্জে উঠল, 'চোপ মাগী, ব্লাডি ব্যাস্টার্ডকি বাচ্চা, আবার চেঁচালে গলা টেনে ছিঁড়ে ফেলব। এই নে তোর টাকা—' পকেট থেকে এক গোছা নোট বার করে মানদার মুখে ছুঁড়ে মারল। তারপর টিয়াকে নিয়ে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল।

আর ফটিক তখনই ঠিক করে ফেলল, জাহাজেই তাকে চলে যেতে হবে।

দিন চারেক পর।

সুটকেশ বিছানা-টিছানা গোছানো হয়ে গেছে। আজই ফটিক খিদিরপুর ডকে গিয়ে ব্যাঙ্ক লাইনের জাহাজে উঠবে।

সকাল থেকেই কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে ফেলেছে টিয়া। ফটিকেরও খুব খারাপ লাগছিল। ভারী ধরা-ধরা গলায় কতবার যে বলেছে, 'এ্যাই মাইরি কাঁদিস না। তুই কাঁদলে আমার যাওয়াই হবে না।'

টিয়া উত্তর ছায় নি। তার কান্নাটা আরো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে শুধু।

ফটিক আবার বলেছে, 'এই যে যাচ্ছি, এই-ই লাস্ট। দেখিস ছ'মাসের ভেতর ফিরে আসব। তখন আর এই নরকে তোকে রাখব না।'

টিয়া ঝাপসা গলায় কিছু একটা বলল।

ফটিক বলতে লাগল, 'এবারও যেতাম না। কিন্তু কী করব বল। ব্লাডি এত ঘুরলাম, কোথাও একটা চাকরি-টাকরি জুটল না; তা ছাড়া হাতেও ক্যাশ-ফ্যাশ নেই। টাকা-পয়সা থাকলেও না হয় কথা ছিল; জাহাজের চাকরিতে গোলি মেরে দিতাম।'

টিয়া বলল, 'একবার জাহাজে উঠলে কি আমার কথা মনে থাকবে!'

'থাকবে রে থাকবে। বাপ-মা, আত্মীয়স্বজন, ফ্রেণ্ডস—সবাইকেই ভুলতে পারি কিন্তু হোল লাইফে তোকে ভোলা সম্ভব না রে।' ফটিক বলতে লাগল, 'এবার যে আসব চাকরি-বাকরি না পেলেও আর যাচ্ছি না। দরকার হলে এই রাজানগরে একটা দোকান-ফোকান খুলে বসব। কিন্তু আর শালা জলে যাচ্ছি না।'

হাতের পিঠে ঘন ঘন চোখের জল মুছতে মুছতে রান্নাবান্না করল টিয়া; জাহাজে ফটিকের খাবার জন্য লুচি-তরকারি করে দিল।

জাহাজ ছাড়বে সেই রাত্তিরে। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর

রেডিও আর ঘড়ি বেচা টাকার যেটুকু বাকি ছিল তার সবটাই টিয়াকে দিয়ে বলল, 'এটা রাখ। আমি জাহাজে উঠে মাসে মাসে তোকে টাকা পাঠাব। একটা কথা ; সাবধানমতো থাকবি। কোন কুত্তার বাচ্চাকে সন্ধ্যেবেলা ঘরে ঢোকাবি না।'

'আচ্ছা—' আস্তে করে মাথা নাড়ল টিয়া।

গাঢ় গভীর গলায় ফটিক বলল, দু মাস এখানে কাটিয়ে গেলাম। তোকে ছেড়ে যেতে ব্লাডি মনটা এত খারাপ হয়ে যাচ্ছে যে কী বলব।'

টিয়া ফোঁপাতে লাগল।

তাকে একটা চুমু খেয়ে ফটিক দরজার দিকে তাকিয়ে ডাকল. 'পেনো—'

পেনো বাইরেই ছিল ; ছুটে এল। বলল, 'কী গুরু ?'

'সাইকেল রিক্সা ডেকে এনেছিস ?'

'ইয়েস বস। বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।'

একটু ভেবে ফটিক এবার বলল, 'টিয়া রইল, তুই ওকে দেখিস পেনো।'

পেনো কাঁধ পর্যন্ত মাথা হেলিয়ে বলল, 'নিশ্চয়ই দেখব গুরু, আমি শালা লক্ষ্মণ যদ্দিন বেঁচে আছি বৌদির জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না।'

'এবার মালপত্তরগুলো নিয়ে সাইকেল-রিক্সায় তোল—'

আগেই ফটিকের বিছানাপত্তর এবং সুটকেশ-টুটকেশ গুছিয়ে রেখেছিল টিয়া। ঝট করে সেগুলো কাঁধে তুলে বাইরে বেরিয়ে গেল পেনো। তার পেছনে ফটিক আর টিয়াও বেরুল। উঠোন পেরিয়ে ওরা সদরের দিকে যেতে লাগল।

ফটিক চলে যাচ্ছে। খবরটা মেয়েপাড়ায় আগেই জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। দুধারের ঘরগুলো থেকে টগর-জবা-কুসুমরা বেরিয়ে এসে

ওদের সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল। সবায়ই মন খুব খারাপ। এমন কি মানদাও বেরিয়ে এসেছে। ফটিকের কাছে ঘন হয়ে হাঁটতে হাঁটতে সে বলল, 'বাবা ফটিক তোমাকে রাগের মাথায় অনেক খারাপ কথা-টথা বলেছি, আমার ওপর রাগ করে থেকো না।'

ফটিক বলল, 'না-না, রাগ আমি কারো ওপর পুষে রাখি না। তা ছাড়া তুমি আমার মায়ের মতো, আমিও তো ভাল কথা তোমায় বলিনি; খিস্তিখেউড় করেছি। কাঁচা ড্রেনের মতো মুখ আমার।'

মানদা বলল, 'সে যাক গে, জাহাজে খুব সাবধানে থাকবে। ঠিক সময়ে খাওয়া-দাওয়া করবে। শরীলটি যদি যায়, সবই গেল।'

ফটিক বলল, 'টিয়াকে তুমি দেখো মাসি; ওর যাতে কষ্টটষ্ট না হয় নজর রেখো—'

'রাখব রে পাগলা, রাখব—'

সদরে এসে মেয়েরা দাঁড়িয়ে পড়ল। ফটিক আর পেনো বড় রাস্তায় যেখানে সাইকেল-রিক্সা দাঁড়িয়ে আছে সেখানে গেল।

রিক্সায় উঠে একবার মেয়েপাড়ার সদর দরজাটার দিকে তাকাল ফটিক। টিয়া দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে; তার দুচোখ জলে ভেসে যাচ্ছে।

সেই যে ফটিক চলে গেল তার মাসখানেক বাদে টিয়ার নামে একশো টাকার মনি-অর্ডার এল। সেই সঙ্গে একখানা চিঠি। ফটিক লিখেছে তারা এখন জাপানে আছে। ওখান থেকে মালপত্র তুলে সিঙ্গাপুর আসবে; সিঙ্গাপুর থেকে এডেন হয়ে সোজা ইউরোপে। ইউরোপ থেকে আমেরিকার চার পাঁচটা পোর্ট ঘুরে দেশে ফিরতে ফিরতে আরো মাস সাতেক লেগে যাবে।

ফটিক আরো লিখেছে, টিয়া যেন তার জন্য না ভাবে; সে খুব ভাল আছে। শুধু দিনরাত টিয়ার কথাই মনে পড়ে। বিশেষ করে

রাত্তিরে। সেই সময়টা এত একা-একা লাগে তার যে লিখে বোঝানো যায় না। টিয়ার জন্য মনটা তখন ভীষণ খারাপ হয়ে যায়।

ফটিক জানিয়েছে, আগে আগে কোন পোর্টে জাহাজ ভিড়লে সে প্রথমেই গিয়ে হাজির হত মেয়েপাড়ায়। যতদিন পোর্টে জাহাজ থাকত ততদিন রোজ একবার করে বেশ্যাপাড়ায় তার হানা দেওয়া চাই-ই। নইলে পেটের ভাত হজম হত না। কিন্তু এবার আর ওসব মেয়েদের ঘাঁটতে ভাল লাগে না। টিয়াকে দেখবার পর ব্লাডি তার মনটাই গেছে বদলে। রাজানগরে এবারে দুটো মাস যে আনন্দ যে সুখ সে পেয়ে এসেছে, পোর্টে পোর্টে কটা চেহারায় 'ফেল কড়ি মাখো তেল'-মার্কা ঢলানি ছুঁড়িদের সাধ্য কি তা দেয়! আজকাল ওসব ছুকরিদের দেখলে থু-থু ফেলতে ইচ্ছে করে। পোর্টের মেয়েদের ছাড়লেও মদটা এখনও ছাড়তে পারি নি ; ওটা ছাড়া যাবেও না। পেটে খানিকটা উগ্র জ্বলন্ত তরল পদার্থ না থাকলে দেড়শো ডিগ্রি উত্তাপের মধ্যে দাঁড়িয়ে জাহাজের বয়লারে কয়লা দেওয়া যায় না।

তা ছাড়া দুনিয়ার নোনা দরিয়ায় দরিয়ায় ঘুরতে হলে নিয়মিত মদটি দরকার। নইলে হাড়ে জং ধরে যাবে।

মানদা, টগর, পেনো, কুসুম ইত্যাদিরা কে কেমন আছে জানতে চেয়েছে ফটিক। অবশ্য তাকে জানাবার উপায় নেই, সে-কথাও লিখেছে। কেননা এখন ফটিকের নির্দিষ্ট কোন ঠিকানা নেই জাহাজে উঠলে কখন তারা কোথায় থাকবে—পোর্টে কিম্বা সমুদ্রে তা বলা মুশকিল। কাজেই টিয়া চিঠি লিখলেও সে পাবে না।

চিঠির শেষের দিকে সে লিখেছে, টিয়া যেন সাবধানমতো থাকে কোন বাগার সোয়াইনকে ঘরে না ঢোকায়।

মাত্র তো ক'টা মাস ; তার পরেই ফটিক ফিরে আসছে। এবার যে আসবে আর সমুদ্রে যাবে না। জাহাজের চাকরি সে ছেড়ে দেবে। টিয়া যেন তার ভালবাসা নেয়। ইত্যাদি ইত্যাদি।

চিঠিটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কতবার যে টিয়া পড়ল, ঠিক-ঠিকানা নেই। তার কি ভাল যে লাগছে, কি ভাল যে লাগছে!

টাকা আর চিঠি আসার খবর পেয়ে এ-পাড়ার অন্য মেয়েরা একজন দু'জন করে টিয়ার ঘরে আসতে লাগল। এমন কি মানদাও এল।

মানদা শুধলো, 'ফটিক কত টাকা পাঠিয়েছে লো টিয়া?'

টিয়া বলল, 'এক শো।'

'ভালো, ভালো। ছোঁড়ার হাতটা খোলা; মনটাও খারাপ না। তা ছাড়া তোকে ভালোও বেসে ফেলেছে।'

টিয়া উত্তর দিল না।

মানদা আবার জিজ্ঞেস করল, 'চিঠিও নাকি পাঠিয়েছে ফটিক?'

টিয়া আস্তে করে মাথা নাড়ল।

'কী লিখেছে?'

ফটিক যা-যা লিখেছে, সংক্ষেপে বলে গেল টিয়া।

সব শুনে মানদা বলল, 'ফটকে তা হলে আমাদের ভুলে যায় নি!'

'মা-মাসিকে কেউ ভোলে নাকি।' টিয়া হাসল।

মানদাও হাসল, 'তা যা বলেছিস।'

টগর বলল, 'সাত-আট মাস পর ভালোদাদা আসছে, আর সমুদ্দুরে যাবে না। আমার কি ভালো যে লাগছে।'

জবা টিয়াকে বলল, 'কপাল একটা করে এসেছিলি টিয়া! আমাদের যা ভাগ্যি, ওরকম একটা মানুষ জুটলে বেঁচে যেতাম।'

ময়না বলল, 'যা বলেছিস! আমাদের কপালে যত মড়াখেগো ভাগাড়ের শকুন এসে জোটে।'

একেকটি মেয়ে একেক রকম মন্তব্য করতে লাগল। শুধু কুসুমই ঠোঁট টিপে দাঁড়িয়ে থাকল। হিংসেয় তার খসখসে ভাঙাচোরা কালো মুখটা পুড়ে যেতে লাগল।

দুপুরবেলা মেয়েগুলো এসেছিল। গল্পে গল্পে বিকেল কাবার করে সন্ধ্যের মুখে মুখে তারা উঠল।

সেই যে মণি-অর্ডারে টাকা এল, তারপর থেকে নিয়মিত প্রতিমাসে আসতে লাগল। ফি-মাসেই গোড়ার দিকে টাকাটা আসে; সেই সঙ্গে আসে একখানা করে চিঠি।

ফটিকের চিঠির বয়ানগুলো সব চিঠিতেই প্রায় একরকম। জাহাজে জাহাজে আর ভালো লাগছে না; টিয়ার জন্য মন খুব খারাপ হয়ে আছে। যত তাড়াতাড়ি পারে সে দেশে ফিরে আসবে।

ফটিকের কাছ থেকে কয়েক হাজার মাইল দূরে বাঙলাদেশের এই কারখানা-শহরের মেয়েপাড়ায় বসে আশায় আর আনন্দে বুক কাঁপতে থাকে টিয়ার। মুখের ওপর দিয়ে থির থির করে সুখের ঢেউ বয়ে যায়;

ফটিকের পাঠানো টাকা আর চিঠি নিয়ে কী যে সে করবে ভেবে পায় না। একবার সেগুলো গালে ঘষে, একবার কপালে ঠেকায়, একবার ঠোঁটে।

চিঠি আর টাকা এলেই এ-পাড়ার মেয়েরা ছুটে আসে। ফটিক এখন কোথায় আছে, কেমন আছে, কবে দেশে ফিরবে, ফিরেই তাকে এখান থেকে নিয়ে যাবে কি না, কোথায় তারা ঘর-সংসার পাতবে ইত্যাদি ইত্যাদি হাজার রকম খোঁজখবর নেয়। তার সৌভাগ্যে বেশির ভাগ মেয়েরই মুখ মলিন হয়ে যায়। শুধু টগরই যা খুশী হয়। সে বলে, 'তোর জন্যে আমার ভাইটার মতিগতি ফিরেছে; ঘর-সংসারী হতে চাইছে। কী তুকই যে করেছিস!'

টিয়া উত্তর ছায় না, খালি হাসে।

হেমন্তের শেষাশেষি ফটিক জাহাজে উঠেছিল। দেখতে দেখতে চারটে মাস কেটে গেল। পৌষ মাঘ ফাল্গুন চৈত্র পার হয়ে

এখন বৈশাখ মাস পড়ে গেছে। সূর্যটা আকাশের গায়ে সারাদিন গন গন করতে থাকে। গাছপালা পুড়ে পুড়ে ধূসর বর্ণ হয়ে যাচ্ছে। উঁচু রাস্তার ওধারে নদীটা শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। সকাল-বিকেল তবু কিছু পাখি চোখে পড়ে; কিন্তু দুপুরবেলা আকাশ একেবারে ফাঁকা। রাস্তাঘাটও তখন সম্পূর্ণ নির্জন হয়ে যায়। তখন রাস্তায় না লোকজন, না সাইকেল রিক্সা-টিক্সা। সব কোথায় যে উধাও হয়ে যায়। রাত্রের দিকটাও খুব আরামের না। তখন নদীর ওধার থেকে অল্প অল্প হাওয়া ছাড়ে ঠিকই কিন্তু সারাদিনের জ্বলন্ত মাটি থেকে ভ্যাপসা তাপ উঠে আসতে থাকে।

ঋতুচক্রে যতই পরিবর্তন আসুক, গ্রীষ্মের আগুনে মাঠ-ঘাট বৃক্ষ লতা জ্বলে জ্বলে যতই খাক হোক, মানুষের প্রবৃত্তি কিন্তু বদলায় না। সন্ধ্যের আলো জ্বলতে না জ্বলতেই মেয়েপাড়ায় আসর জমে উঠতে শুরু করে। মাতাল আর লম্পটেরা কেন্নোর মতো বুকে হেঁটে হেঁটে ঠিক এখানে এসে হাজির হয়। শীত-গ্রীষ্ম বর্ষা-হেমন্ত এই একটা নিয়মের শুধু পরিবর্তন নেই।

পেনো সেই কাগজে 'গেরস্ত ঘর' কাথাটা লিখে টিয়ার ঘরের দরজায় সেঁটে দিয়েছিল সেটা এখনও আছে। যারা মেয়েপাড়ায় ফুর্তি লুটতে আসে তারা এতদিনে জেনে ফেলেছে ওই ঘরটায় প্রবেশ নিষেধ। পেনোর গণ্ডি-কেটে-দেওয়া নিষিদ্ধরাজ্য তারা মাতাল অবস্থাতেই খুব সতর্কভাবে এড়িয়ে চলে।

পৌষ থেকে চৈত্র, পর পর চার মাস ফটিকের মণি অর্ডার এল। টাকাটা আসে প্রতি বাঙলা মাসের গোড়ার দিকে। কিন্তু বৈশাখ মাস পড়বার পর দশ বারো দিন কাটল কিন্তু এখনও টাকা আসার নাম নেই।

দেখতে দেখতে বৈশাখ মাস কেটে গেল। তারপর জ্যৈষ্ঠ পেরিয়ে

আষাঢ়ও যায় যায়। কিন্তু না আসে ফটিকের মণি অর্ডার, না একটা চিঠি। এ ক'টা মাস টিয়ার কি কষ্টে যে কাটছে সে-ই শুধু জানে।

দু-তিন মাস যে টাকাপয়সা চিঠিপত্র আসছে না, এ-খবরটা মেয়ে-পাড়ায় জানাজানি হয়ে গেছে।

সেই বৈশাখ মাস থেকে টগর মানদা কুসুমরা প্রায় রোজই টিয়ার ঘরে হানা দিচ্ছে। আর জিজ্ঞেস করছে, 'হ্যাঁ লো টিয়া, কিছু খবর-টবর এল ?'

মুখ নিচু করে বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়ে টিয়া. 'না।'

টগর বলে 'ছাখ আর ক'দিন '

মানদা বলে, 'ছাখ ছাখ করে তো তিন মাস কেটে গেল।'

জবা বলে, 'কত দূর দেশে গেছে ফটকেদা ; সেখান থেকে টাকা পাঠাতেও তো সময় লাগে।'

কুসুম যে এমন হিংসুক, টিয়ার জন্য সহানুভূতিতে তার মনও সিক্ত হয়। ভরসা দেবার মতো করে বলে, 'ভাবিস না, শিগগিরই চিঠিপত্তর এসে যাবে।'

ফটিকের কী হল, তার একটা যে খবর-টবর নেবে তারও কোন উপায় নেই। এত বড় পৃথিবীর কোন সমুদ্রে সে ভাসছে, কে জানে। তার সঙ্গে যোগাযোগ করা অসম্ভব। দুর্ভাবনায় অস্থিরতায় দিন কাটতে থাকে টিয়ার।

দু-তিন মাস পেরুবার পর মানদা কিন্তু মুখ বুজে থাকলো না ; ভাড়ার জন্য তাগাদা দিতে শুরু করল। মণি অর্ডার আসা বন্ধ হবার পর সে আর ভাড়া-টাড়া দিতে পারেনি।

টিয়া কাঁচুমাচু মুখে বলল. 'আর ক'টা দিন ধৈর্য ধর মাসি। ও টাকা পাঠালেই তোমাকে দিয়ে দেব।'

'ফটকে আর টাকা পাঠাবে না।'

'এ তুমি কী বলছ মাসি! অতদূর দেশে গেছে; হয়তো কোন বিপদ-আপদ হয়েছে।'

'আমার কি মনে হয় জানিস?'

'কী?'

মানদা বলল, 'মুখপোড়া তোকে হয়তো ভুলেই গেছে টিয়া—

টিয়া চমকে উঠলো; কিছু বলল না। চোখদুটো তার করুণ ভারাক্রান্ত হয়ে থাকল।

মানদা আবার বলল, 'ছোঁড়াকে তো জানি। জাহাজে জাহাজে হাজার জায়গায় ঘুরে ডবকা ডবকা মেমসাহেব পাচ্ছে; তোর কথা কি এখন আর তার মনে আছে!'

টিয়া ব্যাকুলভাবে বলল, 'না গো মাসি, সে সে-রকম মানুষ না।

'তুই আর ক'দিন ওকে জানিস; ফটকেকে সেই জোয়ান বয়েস থেকে দেখে আসছি। জাহাজে যাবার পর ও যে চার মাস টাকা পাঠিয়েছে এ ই ঢের। আর ও টাকা পাঠাবে না। তোর পেছনে টাকা লাগিয়ে ফটকের কী লাভ বল্—

টিয়া উত্তর দিল না।

মানদা বলতে লাগল, 'বয়েস তো কম হল না; এই মেয়েপাড়ায় দেখলামও অনেক। ফটকের মতো চুলকুনি অনেকেরই ওঠে। ভালবাসার কথা বলে, ঘর-সংসারের কথা বলে, তারপর চোখের আড়ালে গেলেই ভুলে যায়। এই সব ছোঁড়া-ছোকরাদের স্বভাব বড্ড খারাপ।

টিয়া কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'এখন আমি কী করব মাসি?'

মানদা বলল, 'আমার কথা যদি শুনিস তা হলে বলব, আখের নষ্ট করিস না। তোকে রাখার জ'ন্য কত বড় বড় পয়সাওলা লোক চারপাশে ছোঁক ছোঁক করছে। তুই একবার মুখ ফুটে 'হ্যাঁ' বল্ না;

রাণীর হালে থাকতে পারবি।'

টিয়া ঝাপসা গলায় কিছু একটা বলল, বোঝা গেল না।

মানদা কি ভেবে এবার বলল, 'ঠিক আছে তোকে এক্ষুনি কিছু করতে বলছি না। ছোঁড়াটার ওপর যখন মন পড়ে গেছে, ছাখ আর ক'দিন—'

আরো একটা মাস কাটল। কিন্তু এখনও ফটিকের কোন খবর নেই।

এই একটা মাস পর মানদা এসে একদিন দুপুরবেলা টিয়ার ঘরে গ্যাঁট হয়ে বসল। বলল, 'ফটকের আশা তুই ছাড় টিয়া। ও আর তোর খবরও নেবে না, টাকাও পাঠাবে না।'

মুখ নিচু করে মেঝেতে নখ দিয়ে দিয়ে দাগ কাটতে লাগল টিয়া।

মানদা বলতে লাগল, 'আয়নায় নিজের চেহারাটা আজকাল দেখিস? পয়সার অভাবে আধ পেটা খেয়ে খেয়ে শুকিয়ে গেছিস। এভাবে চললে ক'দিন আর বাঁচবি? আমি কী বলি শোন্—'

টিয়া চোখ তুলে তাকাল।

মানদা বলল, 'ছোঁড়াকে তুই ভুলে যা। সুরথ কুণ্ডুকে তোর মনে আছে?

টিয়া শুধলো, 'কে সুরথ কুণ্ডু?'

'ওই যে রে যার ইটখোলা ধানকল-টল আছে। তোর জন্যে ফটিক যাকে খুব ঠেঙিয়েছিল—'

টিয়া বলল, 'হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে।'

'তোকে দেখার পর থেকে সুরথ আমার কাছে লোক পাঠাচ্ছে; এই তো পরশু দিনও পাঠিয়েছিল—'

'লোক পাঠাচ্ছে কেন?'

'কুণ্ডু তোকে রাখতে চায়। নদীর ওপারে দোতালা একখানা বাড়ি তোকে লিখে দেবে সে; তাছাড়া চাকর বাকর রান্নার লোক দেবে,

মাসে মাসে হাত খরচা পাবি তিনশো টাকা করে। ভেবে ছাখ—'

চিন্তা করার শক্তি ফুরিয়ে এসেছিল টিয়ার। সে বলল, আমি আর কিছু ভাবতে পারছি না মাসি।'

মানদা বলল, 'ভেবে আর দরকার নেই। তোর ভাবনা চিন্তাগুলো এখন আমার ওপর ছেড়ে দে। আমি বলি কি কুণ্ডুবাবুর কাছে তুই চলে যা ; দুধে ভাতে থাকবি।'

'তুমি যা ভালো বোঝো তাই কর।'

দিন কয়েক পর এক দুপুরে সুরথ কুণ্ডুর দু'জন লোক এল টিয়াকে নদীর ওপারে নিয়ে যেতে। একটা বড় বাহারে নৌকো নিয়ে এসেছে তারা। নদী পেরুলেই কুণ্ডুর ইটখোলা ; তার গা ঘেঁষে নতুন একখানা দেতলা বাড়িতে টিয়ার থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে।

এখন সূর্যটা খাড়া মাথার ওপর স্থির হয়ে আছে নদীর পাড়, ওধারের দোকানপাট, সাইকেল রিক্সার স্ট্যাণ্ড—চারদিক ঝিম মেরে রয়েছে।

এই গরমের দুপুরটায় মেয়েপাড়ায় কিন্তু ঢিলেঢালা ঝিম-মারা ভাব নেই। টগর-কুসুম-জবা মানদা থেকে শুরু করে পেনো পর্যন্ত সবাই টিয়ার ঘরের দরজায় হুমড়ি খেয়ে আছে। ঘরের ভেতর টিয়া তার মালপত্র বেঁধে ছেঁদে আয়নার সামনে সাজতে বসেছিল। চুল আঁচড়ে খোঁপা বাঁধা আগেই হয়ে গেছে ; কমলা রঙের মাদ্রাজী সিল্কের একটা শাড়িও সে পরে নিয়েছে। এখন চোখে লম্বা করে কাজলের টান দিচ্ছে। সাজছিল ঠিকই, কিন্তু টিয়ার মুখ ভাবলেশ-শূন্য— দেখে মনে হয়, মরা মানুষের মুখ।

টিয়াকে যারা নিতে এসেছে, সুরথ কুণ্ডুর সেই লোকদুটো মেয়েপাড়ার সদর দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। ডাক এলেই মালপত্র

সমেত টিয়াকে নিয়ে নৌকোয় তুলবে। টিয়ার ঘরের বারান্দায় মেয়েপাড়ার মেয়েগুলো চাপা গলায় ফিস ফিস করছিল।

কুসুম বলছিল, 'ওর নাম আবার সুখ! খাবে পরবে অবিশ্যি ভাল। কিন্তু কি আশা করেছিল মেয়েটা; ভালোদাদার সঙ্গে ঘর বাঁধবে, সংসারী হবে। কী চেয়েছিল আর কী হল! আমার বড় কষ্ট হচ্ছে টিয়াটার জন্যে।'

মানদা বলল, 'যা চেয়েছিল তা যখন পেল না তখন এ-ই ভাল।'

পেনো বলল, 'গুরুর যে শ্লা কী হল! ভেবেছিলাম ফটকেদা ঘর সংসার করলে মেয়েপাড়া ছেড়ে তার কাছে গিয়ে উঠব। পেটের জন্য একটা বিজনেস-ফিজনেস লাগিয়ে দেব। তা শ্লা কিছু হল না—'

ঠিক এই সময় সদর দরজার দিক থেকে ডাক-পীওনের গলা ভেসে এল, 'টিয়ারাণী দাসী আছে? টিয়ারাণী দাসী—'

টিয়া শুনতে পেয়েছিল; সে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ওদিকে ডাকতে ডাকতে পীওনটা টিয়ার ঘরের কাছে চলে এসেছিল।

টিয়া সাগ্রহে বলল, আমি টিয়ারাণী দাসী। চিঠি এসেছে?'

পীওন মাথা নাড়ল, 'না। টাকা এসেছে; অনেক টাকা—'

'কে পাঠিয়েছে?'

'একটা জাহাজ অফিস থেকে এসেছে।'

'কত টাকা?'

'দশ হাজার।'

'দশ হাজার!' ফিস ফিস করে উচ্চারণ করল টিয়া, 'কিন্তু এত টাকা--'

ইনসিওর করা একটা লম্বা খাম টিয়ার হাতে দিয়ে চিরকুটে সই করে দিতে বলল পীওনটা! কাঁপা হাতে সই বসিয়ে খামটা খুলতেই গোছা গোছা নোট বেরিয়ে এল। সেই সঙ্গে ইংরেজিতে টাইপ করা জাহাজী কোম্পানির একটা চিঠি।

টিয়া বলল, 'আমি তো ইংরেজি পড়তে পারি না ; চিঠিতে কী লেখা আছে ?'

পীওনটা লেখা পড়া জানা ছেলে। সে চিঠি পড়ে মানে বুঝিয়ে দিল ; এই টাকাগুলো ফটিকের। এবার ফটিক যে জাহাজে গিয়েছিল সেটা ভূমধ্য সাগরের কাছে মাস চারেক আগে ডুবি হয়ে যায়। তার পর থেকে তিরিশ জন ক্রুর সঙ্গে ফটিক নিখোঁজ হয়ে যায়। অনেক চেষ্টা করেও জাহাজ কোম্পানি তার সন্ধান পায় নি। কাজেই অনুমান করা হচ্ছে ফটিক আর জীবিত নেই।

জাহাজে উঠবার আগে এবার ফটিক তার প্রেভিডেণ্ট ফাণ্ড আর গ্রাচুইটির সব টাকা টিয়ার নামে লিখে দিয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ তার যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে সব টাকা পাবে টিয়া।

ফটিকের ইচ্ছা এবং ব্যবস্থা অনুযায়ী তার প্রাপ্য সমস্ত টাকা কোম্পানি টিয়ারাণী দাসীর নামে পাঠিয়ে দিচ্ছে।

টাকা আর চিঠি বুকে চেপে ধরে নিজের ঘরে ছুটে এল টিয়া। তারপর বিছানায় উপুড় হয়ে সারা দুপুর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। ধীরে ধীরে তার ঘরের দরজা থেকে ভিড়টা পাতলা হয়ে গেল।

গোটা দুপুরটা কেঁদে বিকেল বেলা উঠে পেনোকে ডাকল টিয়া। বলল, 'একটা রিক্সা ডেকে নিয়ে আয় তো—'

পেনো জিজ্ঞেস করল, 'রিক্সা দিয়ে কী হবে ?'

'ডেকেই আন না—'

পেনো রিক্সা ডেকে আনলে একটা টিনের বাক্স হাতে ঝুলিয়ে টিয়া বেরিয়ে পড়ল।

মেয়েপাড়ার অন্য মেয়েরা এ-বারান্দায় সে বারান্দায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে ছিল। মানদা হামানদিস্তায় পান ছেঁচতে ছেঁচতে সুরথ কুণ্ডুর সেই লোকদুটোর সঙ্গে কি কথা বলছিল। টিয়াকে দেখে মানদা

চমকে উঠল, 'কোথায় যাচ্ছিস রে টিয়া ?'

টিয়া আবছা গলায় বলল, 'চলে যাচ্ছি, আর আসব না।'

'কিন্তু কুণ্ডুমশাই যে লোক পাঠিয়েছে ; তাদের কী হবে ?'

'তাদের ফিরে যেতে বল—' বলতে বলতে এগিয়ে যেতে লাগল টিয়া।

মানদা হামানদিস্তা ফেলে উঠে দাঁড়িয়েছিল। সে বলল, 'কোথায় যাচ্ছিস টিয়া ?'

'দেখি কোথায় যাই ' চলতে চলতে একবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল টিয়া। অবরুদ্ধ গলায় বলল, 'সে বলেছিল ফিরে এসে আমাকে এই নরক থেকে উদ্ধার করবে। নিজে সে এল না ; কিন্তু নিজের প্রাণটা দিয়ে আমার বাঁচবার পথ করে দিয়ে গেছে। এমন করে আমার কথা আর কেউ কোনদিন ভাবেনি গো, কেউ ভাবে নি।' টিয়া আবার চলতে শুরু করল।

এধার-ওধার থেকে কুসুম, পদ্মা, টগর, মানদা, সবাই দেখল রাজা-নগরের মেয়েপাড়া ছেড়ে চলে যাচ্ছে টিয়া।
